আমি সম্রাট

মনোজ বসু

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ।। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়, ১৩৬৫
জুন, ১৯৫৮

প্রকাশক :
ধীরা মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর :
মঙ্গলচণ্ডী প্রিণ্টার্স
৬৭/এ, ডবলু সি ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৬

ঘোষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
স্বর্ণলতা ঘোষ
৫৭/২ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী :
বাবলু বর্মণ

আমি সম্রাট

।। এক ।।

ঝোপঝাড়ের মধ্যে তালপাতার কুঁড়েঘর। বেরিয়ে আসে—জঙ্গুলে পথে ময়ূর পেখম ধরে বেরুল যেন। অপরূপ।

শুধু রূপে নয়, লেখাপড়াতেও। রিফিউজি ছেলেদের জন্য দয়াময় সরকার বাহাদুর ইস্কুল বানিয়ে দিয়েছেন, বিল্ডিংখানা দেখে চক্ষু ঠিকরে যাবে। বিল্ডিংয়েই বাজেট শেষ—তা হলেও মাস্টার বাদ দিয়ে ইস্কুল চালানো ভাল দেখায় না, কয়েকটি তাই রাখতে হয়েছে। ঠিক মতো মাইনে মেলে না বলে তাঁরাও শোধ তুলে নিচ্ছেন। ক্লাসের চেয়ারে বসা মাত্রেই নাসা-গর্জন।

অরুণেন্দু এতৎসত্ত্বেও শুধু সাদামাটা পাশ নয়—মার্কশিট দেখে হেডমাস্টার বলছেন, স্কলারশিপও নির্ঘাৎ একটা পেয়ে যাবে। আহ্লাদে ডগমগ হয়ে মা অমনি বললেন, চাকরি নিয়ে নে এইবারে। যেমন-তেমন চাকরি দুধ-ভাত।

যশোদা সেই সাবেক কালের মধ্যে আছেন। পাশ একটা যখন দিয়েছে, শতেক চাকরি পদপ্রান্তে লুটোপুটি খাচ্ছে—বেছে নেবার অপেক্ষা। এবং নেবার সঙ্গে-সঙ্গে ভাতের একটা পাহাড় ও দুধের এক সমুদ্র ডাইনে-বাঁয়ে এসে পড়ল—খাও ফেলাও ছড়াও যেমন খুশি।

পূর্ণেন্দু অরুণেন্দু দুই ভাই আর মা যশোদা—তিনজন নিয়ে সংসার। বড়ছেলে পূর্ণকে নিয়ে মায়ের ভয় ঘোচে না। বলেন, তাড়াতাড়ি চাকরি নিয়ে নে অরু, পুন্নকে ঘরে এনে বসাই। বেরিয়ে যায় সে, আমি ঘুরি-ফিরি আর ঠাকুরের পটের কাছে মাথা কুটি :

ঘরের ছেলে সুভালাভালি ঘরে এনে দাও ঠাকুর। 'দোর খোল মা—' উঠোনে এসে ডাক দেয়, ধড়ে প্রাণ আসে আমার তখন।

এঁদের বউ আমলে যেমনধারা ছিল, মা-জননী ভাবেন এখনো তেমনিটি বুঝি। অরুণদের বাড়ি কোন পুরুষে কেউ চাকরি করে নি। সে পরিমাণ বিদ্যা ছিল না, কষ্ট করে বিদ্যার্জনের প্রয়োজনও মনে করে নি কেউ। তরিতরকারি গোয়ালের গরুর দুধ বিলবাঁওড়ের মাছ—কোন রকম অভাব ছিল না। কাপড়-জুতো এবং এটা-ওটার জন্য যৎকিঞ্চিৎ পয়সাকড়ির গরজ—ধানপাট বেচে সঙ্কুলান হয়ে যেত। ক্রমশ গাঁয়ের দুটি-চারটি ছেলে পাশ করে শহরের চাকরি নিতে লাগল। অবরে-সবরে তারা বাড়ি আসে—নতুন কেতার পোশাক-পরিচ্ছদ, বাঁকা ঢঙের কথাবার্তা, গায়ে ভুরভুরে গন্ধ—চলে যাবার পরেও কতক্ষণ ধরে বাতাসে গন্ধ উড়ে বেড়ায়। যে ক'টা দিন গাঁয়ে থাকে, রমারম খরচা করে চাকরে ছেলেগুলো। দরদাম করে না—জেলে ভেটকি মাছ বেচতে এসেছে, আট আনা চাইল তো ঠক করে আস্ত আধুলিখানা ছুঁড়ে দিয়ে মাহিন্দারকে মাছ তুলে নিতে বলে। রাজরাজড়ার কাণ্ডবাণ্ড—যশোদার স্মৃতিতে সব রয়ে গেছে। পাশ করেছে তো অরুও চাকরি নিয়ে সর্বদুঃখের অবসান ঘটাক।

বললেন, চাকরি হলেই সর্বনেশে কাজ ছাড়িয়ে পুন্নকে তুই বাড়ি এনে বসাবি। বিনি কাজে বসে থাকবার মানুষ সে নয়—রাস্তার ধারে চালা তুলে বরঞ্চ একটা তেল-নুনের দোকান করে দিস।

আজ অরুণ একলা খেতে রাজি নয়। দাদা ফিরুক, সুখবর দিই আগে তাকে—পাশাপাশি দু-ভাই তখন বসা যাবে।

রাত ঝিমঝিম করছে। অন্ধকার ঘরে মা আর ছেলে—বিনি কাজে এরা কেরোসিন পোড়ায় না। আনন্দ উথলে উঠেছে, আসন্ন সুদিনের নানান গল্প হচ্ছে মৃদু কণ্ঠে।

অবশেষে পায়ের শব্দ উঠানে। পূর্ণেন্দু বলে, এসেছি মা—আলো জ্বালো।

একছুটে উঠানে গিয়ে অরুণ দাদার পায়ে গড় করল : পাশ হয়েছি দাদা।

মার্কশিট হাতে দিল তার। মার্কশিট না দেখে পূর্ণ হাঁ করে ভাইয়ের মুখে তাকিয়ে থাকে।

অরুণ বলে, স্কলারশিপও পেয়ে যেতে পারি, হেডমাস্টার মশায় বললেন।

হাসছে না কাঁদছে—পূর্ণেন্দু ঠিক একেবারে পাগলের মতন করতে লাগল। ফতুয়ার বোতাম পটপট করে খুলে ভাইয়ের হাতখানা টেনে বুকের উপর রাখল।

তোলপাড় লেগে গেছে এখানে—ঠাহর পাচ্ছিস ? এত সুখ জীবনে পাই নি রে—আমাদের বংশে কেউ কখনো পাশ করে নি। তুই প্রথম।

অরুণ হতভম্ব হয়ে আছে।

কিছু শান্ত হয়ে পূর্ণেন্দু বলে, আমায় বিদ্বান করবার জন্য বাবা তা-হদ্দ চেষ্টা করেছিলেন। হল না, কপালে না থাকলে হয় না। গাছ-গরু হয়ে আছি। বাবার সাধ তুই পূরণ করবি, উপর থেকে তিনি দেখবেন। বংশের মুখোজ্জ্বল করবি তুই।

যশোদা রান্নাঘরে ভাত বাড়তে গিয়েছিলেন, খাবার জল গড়াতে এ-ঘরে এলেন। গভীর কণ্ঠে পূর্ণ বলল, চিরদুঃখিনী মা আমাদের—সারা জন্ম দুঃখধান্দা করেছেন। এগারো বছর বয়সে, শুনি, বউ হয়ে এসেছিলেন। সেই থেকে এক-হাতে সংসার ঠেলে চলেছেন। মানুষ হয়ে মায়ের সুখশান্তি সকলের আগে দেখবি তুই।

খেটেখুটে পূর্ণেন্দু অত রাত্রে কাল বাড়ি ফিরেছে, বেলা অবধি ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেবে—উপায় আছে তার! ঘোর থাকতে উঠে কেউ না জাগতে সে বেরিয়ে চলে গেছে। গেছে নিকারিপাড়ায়। পূববাংলা ছেড়ে এসে এই নিকারিরাও এক পাড়া জমিয়ে বসেছে। ভেড়ির মাছ পাইকারি কিনে হাটে হাটে বেচে বেড়ায়। অত ভোরে যাওয়ার মানে এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঘুরে সব চেয়ে সরেস গলদাচিংড়ি কেনা। দেরি হলে নিকারিরা বেরিয়ে পড়বে, ভাল জিনিস মিলবে না।

অরুণেন্দু রাগারাগি করে: নিয়েছে কত, জিজ্ঞাসা করি। দর বলবে না সে জানি। কষ্টের টাকা কেন এমন ছিনিমিনি করবে। আমি যেন পর—বাড়ির মানুষ আর নই, কুটুম্ব হয়ে গেছি।

পূর্ণেন্দু তাড়া দিয়ে ওঠে: ছোট আছিস, ছোটর মতন থাক। বড়ভাইয়ের উপর বচন ঝাড়বিনে।

বেশ, থাকলাম তাই। একটি কথাও বলছিনে। খাওয়া তো আমার এক্তিয়ারে—তখন দেখা যাবে। ঐ চিংড়ি তোমায় খেতে হবে। পাতে বসলে ধরে পেড়ে খাইয়ে দেবো, তখন বুঝবে।

যশোদাও দেখা গেল ছোটছেলের দিকে। বললেন, সত্যি, ও-মাছের কি দরকার ছিল। বড় কলেজে পড়ানোর আস্থা—তাতে তো বিস্তর খরচ। কষ্টের রোজগার নয়-ছয় করলে চালাবি কেমন করে তুই?

পূর্ণেন্দু বলে, নিত্যিদিন তো নয়—শখ হল আমার, এই একটা দিন। চিংড়ির নামে অরু পাগল, ভুলে গিয়েছ?

পুরানো কথা মনে এসে হাসিতে মুখ ভরে গেল। কী-একটা ব্যাপারে বড্ড খুশি হয়ে পূর্ণ বলেছিল, তুই যা চাবি অরু, তাই দেবো। পাঁচ-ছ বছরের তখন অরু। জামা-জুতো নয়, ব্যাট-বলও নয়, অরু চেয়ে বসল চিংড়িমাছ।

হাসতে হাসতে পূর্ণেন্দু বলে, বড় হয়েছে এখন—অবস্থা বুঝে খাওয়ার কথা আর বলে না। কিন্তু আমি ভুলি নি। তুমি বকাঝকা কোরো না মা, ঘৃণাক্ষরে ওর কানে না পৌঁছয়। একে রামানন্দ তায় ধূনোর গন্ধ—তোমায় দলে পেলে ভাই একেবারে পেয়ে বসবে।

গরিবের ঘোড়া-রোগ। পূর্ণেন্দুর মাথায় চেপেছে ভাইকে প্রেসিডেন্সিতে পড়াবে।

অবাক হয়ে অরুণ বলে, মাইনেই কত টাকা, জানো? গোবরডাঙা কলেজ বেশ ভালো। কাছাকাছি হবে। প্রিন্সিপালের সঙ্গে একদিন কথাবার্তাও বলে এসেছি।

পূর্ণেন্দু জুড়ে দিল: প্রেসিডেন্সিতে পড়বি আর হিন্দু হস্টেলে থাকবি তুই।

ঠিক তুমি গুপ্তধন পেয়েছ দাদা, আমাদের কিছু বলো নি।

ভাইয়ের কথা কানে না নিয়ে পূর্ণেন্দু বলে যাচ্ছে, হরিহর স্যুরের ছেলে ভূপেনও হিন্দু হস্টেলে থেকে পড়ে। দু-জনে এক ঘরে না হোক এক বাড়িতে বেশ থাকতে পারবি। হরিহরবাবুর কাছ থেকে জেনেশুনে এলাম। খরচপত্র ভাবতে গেলে হবে না। প্রেসিডেন্সিতে আর অন্য কলেজে আকাশ-পাতাল তফাত—প্রেসিডেন্সির আলাদা ইজ্জত।

অরুণ বলে, কিন্তু তোমাদের? নুন আর আলুভাতে-ভাতের উপরে আছ—ভাই পড়াতে গিয়ে তা-ও বন্ধ হয়ে যাবে। শহরের উপর নবাবি করব আর আমার মা-ভাই উপোস করে মরবে, সে আমি কিছুতে পারব না। অন্য কলেজেও পাশ করে থাকে দাদা।

পাশ করলেই তো হল না—

অরু বলে, ভাল রেজাল্টও করে থাকে।

পূর্ণেন্দু বলে, তা ছাড়াও আছে। প্রেসিডেন্সিতে বড় বড় লোকের ছেলেরা পড়ে। বাবার জোরে মামার জোরে পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তারা লাটবেলাট হয়ে যাবে। ক্লাসফ্রেণ্ড সম্পর্ক ধরে চাকরি-বাকরির জন্যে তাদের কাছে পড়বি গিয়ে তখন। অনেক ভেবে দেখেছি রে। হরিহরবাবুও তাই বললেন: খরচা বেশি হলেও আখেরে ভাল, ঢোকাতে পারেন তো দৃকপাত করবেন না। ভূপেনের বাবদে যা পড়ে, তারও মোটামুটি একটা হিসাব নিয়েছি।

পারবে তুমি?

সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে পূর্ণেন্দু বলল, আমার যে কাজ—আজকে হয়তো ঠ্যাঙানি খেলাম, কাল আবার রাজা হয়ে ফিরলাম। কিচ্ছু ভাবিস নে তুই। কাঙালের ঠাকুর আছেন—যে খায় চিনি, জোগান তাকে চিন্তামণি।

খপ করে অরুণেন্দুর হাত দুটো জড়িয়ে ধরল সে: ব্যাগগেতা করছি ভাইডি, ইচ্ছে আমার বানচাল করে দিস নে। প্রেসিডেন্সি থেকে বি-এ পাশ কর, তার পর আর বলতে যাবো না। যা খুশি করিস।

॥ দুই ॥

অতএব অরুণেন্দু প্রেসিডেন্সিতে পড়ে, হস্টেলে থাকে। ক'মাসের মধ্যেই হিন্দু-হস্টেল ছেড়ে সস্তা মেস একটা দেখে নিল। হুকুম একেবারে কমা-সেমিকোলন অবধি মানতে হবে, এমন লক্ষ্মণ ভাই এ যুগে হবে না—পূর্ণেন্দু তাতে রাগই করুক আর যা-ই করুক।

মেসে থাকে, আর সকাল-সন্ধ্যার জন্য ট্যুইশানি খুঁজে বেড়ায়। বন্ধুবান্ধব সকলকে ট্যুইশানি জুটিয়ে দিতে বলে। না-জানি কোন রাজা-উজিরের বেটা—চেহারায় তাই মালুম হয়। চেহারার গুণে বিস্তর ছেলে এবং কতকগুলো মেয়েও ঘেঁসে এসেছিল। সেই ব্যক্তি জনে জনের কাছে ট্যুইশানির দায় জানাচ্ছে, শুনে সব তাজ্জব হয়ে কেটে পড়ছে। ভরসা কেউ দেয় না: এম-এ পাশ বি-টি পাশ মাস্টারমশায়রা ক্লাসে ক্লাসে টোপ ফেলেও গাঁথতে পারেন না—আর এই রকম নধর তরুণ ছেলে, গ্রাজুয়েটও নও এখন অবধি,-তোমায় কে ছেলে-মেয়ে পড়াতে দিচ্ছে!

পাচ্ছেও তো কেউ কেউ—

কী জানি কেমন করে পায়। জানা নেই। তা দেখ তুমি—

শনিবারে অরুণেন্দু বাড়ি যায়। আগে ফি শনিবারে যেতো। থার্ড ইয়ারে পড়াশুনোর বেশি চাপ বলে ইদানীং সব শনিবারে ঘটে ওঠে না। বনগাঁ স্টেশনে নেমে মাইল-চারেক পায়ে হাঁটা। কসাড় জঙ্গল ছিল আগে, বুনোশূয়োর ঘোঁত-ঘোঁত করে ঘুরত। দেশ ভাগ হবার পর নিঃসম্বল রিফিউজিরা জঙ্গলের খানিক খানিক কেটে খড়ের বা পাতার ছাপড়া তুলেছে। দুই ছেলে নিয়ে যশোদাও অমনি একটা তুলে নিয়েছিলেন। ছেলেরা তারপর বড় হয়ে উঠল, যশোদাও বুড়ি হয়ে পড়েছেন। খরচার টাকা পূর্ণেন্দু একসঙ্গে দিতে পারে না—অরুণ বাড়ি এলে যেদিন যতটা পারে দিয়ে দেয়। প্রাণ হাতে

করে রোজগার—এক একটা টাকার সঙ্গে দুর্ভোগ দুশ্চিন্তা আর লাঞ্ছনা জড়ানো। দাদার টাকা মুঠোয় নিয়ে অরুণের হাত জ্বালা করে, চোখে জল এসে যায়।

ঘরে ঘরে টিউটর রাখে, একের অধিক কোন কোন ক্ষেত্রে। শহর কলকাতার রেওয়াজ। ঝি-চাকর রাখতে পারে না যে গৃহস্থ, সে-ও টিউটর একটি রাখবে। ছেলে-মেয়ের পাশ হওয়ার বাবদে চাই-ই ওটা। ট্যুইশানির জন্যে অরুণেন্দু জোর খোঁজাখুঁজি লাগিয়েছে। বন্ধুবান্ধবেরা একেবারে মিথ্যে বলে নি, দিনকে-দিন মালুম হচ্ছে। ইস্কুলমাস্টারের দিকেই সকলের ঝোঁক। অহরহ শেখানো পড়ানো নিয়েই থাকেন, ঐ কর্মে সাতিশয় দক্ষ, সন্দেহ নেই। তার জন্যেও নয় কিন্তু। তাঁদের কাছে পড়লে তরতর করে এগিয়ে ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসতে পারবে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র বাধা পাবে না। ট্যুইশানির পাইকারি ব্যবস্থাও আছে, যার নাম কোচিং ক্লাস। গৃহস্থ-পোষা আয়োজন, কম খরচায় কাজ সমাধা—একলা একখানা ট্যাক্‌সি না নিয়ে সকলে মিলে বাসে চললাম, এই আর কি!

এঁদের সকলের উদরপূর্তির পর বাইরে কিছু কিছু না ছিটকে পড়ে, এমন নয়। তবে বিস্তর মুখ হাঁ হয়ে আছে। অরুণেন্দু কতজনকে বলল—সামান্য-চেনা মানুষকেও দুম করে বলে বসে. সে মানুষ অবাক হয়ে যায়।

সবাই এড়িয়ে যায়, কেউ কিছু করল না। কায়দা মতন পেলে আপনজনকেই তো জুটিয়ে দেবে। যত সামান্যই হোক, ফোকটের রোজগার কে ছেড়ে দেয়। লক্ষপতির পুত্রও বাপের অজান্তে ট্যুইশানি করে কলেজ পালিয়ে সিনেমা ইত্যাদি ইত্যাদির দায়ে। অরুণেন্দু জানে তেমনি ক'জনকে।

কেউ কিছু না করল তো নিজেই হদ্দমুদ্দ দেখবে। মতলব ঠিক করে সন্ধ্যার পর একদিন সে বেরিয়ে পড়ল। হিন্দু হস্টেল ছেড়ে

বাজে মেসে উঠেছে, বাড়তি কিছু আয় করে দাদার দায় হালকা করবে সেই প্রত্যাশায়। গলি ধরে চলেছে, এক একটা বাড়ি ঢুকে পড়ছে—

আপনি নাকি মাস্টার খুঁজছেন ?

গৃহকর্তা চমকিত হয়ে বললেন, কে বলল ?

তারণকৃষ্ণ রায়—

যা-খুশি নাম একটা বানিয়ে বলে দিল। ত্রিলোকতারণ বললেই বা ঠেকাত কে ?

কর্তা ঘাড় নেড়ে দিলেন : না, মাস্টার তো রয়েছেন।

মহাশয়-লোক ইনি, সংক্ষেপে ছাড়লেন। অন্যত্র ঢুঁ দেওয়া যাবে এবার।

কিন্তু অনেকে আছেন কাঁঠালের আঠার মতন। সহজে রেহাই নেই, জেরার পর জেরা : নাম কি তোমার বাপু ? পড়াশুনো কদ্দূর ? কে কে আছেন তোমার ? তারণকৃষ্ণটি কে ? কদ্দিনের চেনা ? কোথায় থাকেন সে লোক ?

বাপরে বাপ, চোখে সরষেফুল দেখিয়ে ছাড়ে। বৃদ্ধটি বোধহয় ফৌজদারি কোর্টের উকিল। দরজার গায়ে নেমপ্লেট লটকানো কিনা, দেখে ঢোকা উচিত ছিল। ভবিষ্যতে সামাল—উকিল-টুকিলের বাড়ি কদাপি নয়।

যাবতীয় জেরা অন্তে উকিলমশায় শেষ পর্যন্ত হয়তো বলে দিলেন, মাস্টার নয়—রাঁধুনি-বামুন পেলে রাখতাম।

বইপত্তরের বদলে হাতা-খুন্তির চর্চায় থাকলে বেশি কাজ দিত, মালুম হচ্ছে ! ঠাকুর বিহনে মেসেও ইতিমধ্যে একটি বেলা উপোস গেছে। রাস্তায় নেমে পড়ে অরুণেন্দু চুকচুক করে : জামা খুলে মালকোঁচা মেরে কেন বললাম না, রান্নাঘর দেখিয়ে দেন কর্তা—

তখন আবার হয়তো নতুন ফ্যাসাদ—জাতে বামুন তো পৈতে দেখাও, গায়ত্রী মুখস্থ বলো, লক্ষ্মীপূজোর পদ্ধতি বলে যাও। আর রসুয়ে-বামুন যখন, ছ্যাঁচড়ায় কি কি মশলার প্রয়োজন সবিস্তার

বর্ণনা দিয়ে যাও……

মেসের রান্নাঘরে মাঝেমধ্যে ঢুকে ছু-চার পদ রান্না শিখে রাখবে ঠাকুরের খোশামুদি করে। এবং খানিকটা ফেটির সুতো কিনে পুষ্ট একগোছা কোমরে রেখে দেবে। বামুনঠাকুর হতে গেলে পৈতের মতন সেই বস্তু কাঁধে তুলে দেবে—অন্য সময় কোমরে বিলুপ্ত রেখে যথারীতি কেরানির উমেদার ভদ্রমানুষ। যেমন দিনকাল, সকল দিক আটঘাট বেঁধে সর্বরকমের বন্দোবস্ত রেখে চলা উচিত। কোন ক্ষেত্রে কোনটা দরকারে লাগে বলা যায় না।

ততক্ষণে আর এক বাড়ি সে ঢুকে পড়েছে। বৃদ্ধা মহিলা, সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এসে চেয়ারখানায় উবু হয়ে বসলেন। ঘাড় কাঁপছে, বসলেই ঘাড় কাঁপে।

মাস্টার চাই মা ?

ছেলেপুলে থাকলে তো মাস্টার ! এক ছেলে আমার, বিয়ে দিয়ে বাঁজা বউ এনেছি। তিরিশবছুরে বুড়ি হতে চলল, ড্যাং-ড্যাং করে লম্ফ মেরে বেড়াচ্ছে। চিকিচ্ছেপত্তোর ঝাড়ফুঁক তাগাতাবিজ্ঞ কত রকম হল—টাকার বৃষ্টি, কিছুতে কিছু নয়। মা-ষষ্ঠীর দয়ায় আসুক ছেলেপুলে সংসারে—মাস্টার লাগবে বইকি। বিনি মাস্টারে মুখ্যু করে রাখব না, তুমিই এসো তখন বাবা।

তবু যা-ই হোক আশা পাওয়া গেল—আজকের কিছু নয়, ভবিষ্যতের। ট্যুইশানি খোঁজাখুঁজি ছেড়ে একটা স্বাধীন ব্যবসা ধরবে নাকি ? সিঁদুর ও খড়িতে বক্ষ-ললাট চিত্রবিচিত্র করে কালীঘাটের অশ্বত্থতলায় আসন জমিয়ে বসে ঝাড়ফুঁক তাগাতাবিজের ব্যবসা ? টাকা পাঁচেক মূলধন—ব্যাপার-বাণিজ্যের নামে চাঁদমোহন বা জয়ন্ত যে-কেউ ওরা ধার দেবে।

কত বাড়ি ঘুরল অরুণেন্দু। দিনের পর দিন ঘুরছে। মানুষের দেখা যাচ্ছে সর্ববস্তুর প্রয়োজন আছে শুধুমাত্র টিউটর ছাড়া। একবার এক মারমুখী পালোয়ান লোকের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল।

কে হে তুমি—জিজ্ঞাসাবাদ নেই, আচমকা ঘরে ঢুকে পড়লে ?

বাইরের ঘর তো—

সামনে পড়ে রুখে দিলাম, নইলে অম্লে ছাড়তে তুমি? বাইরের ঘর থেকে ভিতরের ঘর, তারপরে শোবার ঘর, দোতলার ঘর—। ব্যাগ হাতড়াতে, বাক্স ভাঙতে, গলা টিপে মেয়েটাকে নিকেশ করে টাকাকড়ি গয়নাপত্তোর হাতিয়ে শটকান দিতে। আকছার করছ তোমরা এই কাজ—

আজ্ঞে, তেমন লোক আমি নই।

নও তার প্রমাণ কোথা? কোঁৎকার মুখে সবাই ভিজে-বেড়াল।

কিছু প্রমাণ পকেটেই ছিল। আজই কলেজের মাইনে দিয়ে এসেছে, বিল-বই মেলে ধরল। ছিল রক্ষে। পালোয়ান নেড়েচেড়ে দেখে, মুখের দিকেও দেখছে কড়া নজর ফেলে। মুখটা ভাগ্যিস কচি-কচি সুকুমার দেখায়। নজর কোমল হয়ে এলো ক্রমশ।

যাও—হুকুম দিল পালোয়ান। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল রে বাবা!

মাস তিন-চার এমনি ঘুরতে ঘুরতে বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়েছিল—ট্যুইশানি জুটেছিল একটা। একটা কেন চারটে—উঁহু, ন'টা।

খুলে বলি।

শ্যামবাজার তল্লাট সম্পূর্ণ সারা করে অরুণেন্দু তখন বাগবাজার ধরেছে। ভোটের সময় যেমন এক-একটা গলির বাড়ি ধরে ধরে ঘোরে। এক সন্ধ্যাবেলা আধ-অন্ধকারে একজনকে সম্পূর্ণ একলা দেখে দুর্গানাম জপতে জপতে সে ঢুকে গেল। ভদ্রলোক রঙে আছেন, মানুষ দেখে সরঞ্জাম ইত্যাদি আলমারির আড়ালে ঠেলে দিয়ে খাড়া হয়ে বসলেন।

মাস্টার রাখবেন?

আলবত রাখব—

ঘোরতর চেঁচামেচি শুরু করলেন ভদ্রলোক : কই গো, কোথায় গেলে? মাস্টার এসে গেছে। একগাদা কথা শুনিয়ে এখন যে আর পাত্তা নেই। সত্যি না মিথ্যে বলেছিলাম, চর্মচক্ষে দেখ এসে এইবার।

তিনি এলেন। ঐরাবত-স্ত্রীলোক—এ্যাব্বড়ো এ্যাব্বড়ো চোখ-জোড়া অরুণেন্দুর দিকে তাক করে নিশ্চল হয়ে রইলেন।

ভদ্রলোক শতকণ্ঠে অরুণেন্দুর গুণাবলীর ফিরিস্তি দিচ্ছেন—সে নিজেও যা-সব কোন পুরুষে জানে না।

কন্দর্পকান্তি চেহারা দেখছ—বনেদি রাজবংশের ছেলে। পড়াশুনোতেও হীরের টুকরো। এইটুকু মানুষ বি-টি পাশ করে হাতিবাগান ইস্কুলে ঢুকে গেছে। তুমি বিশ্বাস করলে না, কিন্তু ইস্কুলে আমি নিজে গিয়ে বলে এসেছিলাম। তবেই এসেছে।

গিন্নির পছন্দ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বহাল।

ওরে ছিটে, ওরে ফোঁটা, ছুটে আয় রে—তোদের মাস্টার এসে গেছে।

ছেলে এলো, মেয়ে এলো। খাসা নামকরণ—ছেলেটা ছিটে, মেয়েটা ফোঁটা। পিছন পিছন লেজুড় একজোড়া—নিতান্তই বাচ্চা তারা। সে দুটো বিন্দু আর বিসর্গ। ছেলেমেয়েরা মায়ের স্বাস্থ্যখানি না পেয়ে বসে, গিন্নি সে বিষয়ে সদাসতর্ক। গোড়াতেই নামের বেড়া দিয়ে আটকেছেন।

বললেন, পড়াবে তুমি ছিটেকে আর ফোঁটাকে। ওদেরই আসল পড়া। বিন্দু-বিসর্গ পড়তে শেখে নি। এমনি এমনি বসে থাকবে—আমার রান্নার মধ্যে গিয়ে জ্বালাতন না করে। অ-আ'র বই একখানা করে দিয়ে দেবো, বসে বসে ছবি দেখবে।

ভদ্রলোক বললেন, তাহলে ঐ কথা রইল। কাল থেকেই—কেমন? কাল সন্ধ্যেবেলা। এবারে এসো।

মাইনের কথা অরুণ তুলতে পারে না, টাকাপয়সার ব্যাপারে তার লজ্জা। কিন্তু বিশাল চোখ দুটো গিন্নি এমনি এমনি ধরেন

না—দৃষ্টি সকল দিকে সজাগ। ধমক দিয়ে উঠলেন তিনি: এসো বললেই অমনি চলে যাবে—দেবে থোবে কি, সেটা তো বলবে।

কত আর? হিসাব কষছেন ভদ্রলোক: ইস্কুলের মাইনে ফোঁটার হল তিন ছিটের চার, একুনে সাতটাকা। সারা দিনমান জুড়ে তারা পড়ায়। ঘরের মাস্টার তুমি কতক্ষণই বা পড়াবে! যাকগে, পুরোপুরি দশ করেই দেবো। কি বলো?

গিন্নির দিকে তাকালেন। গিন্নি অধিক উদার, বোধকরি কর্তার পকেট থেকে যাচ্ছে বলেই। ঘাড় নেড়ে বলে দিলেন, উঁহু, পনর টাকা।

।। তিন ।।

জীবনের প্রথম চাকরি। মাস অন্তে পনেরখানি টাকা—দৈনিক মোটামুটি আটআনা। ধনভাণ্ডারের চাবিকাঠি আলিবাবার হাতের মুঠোয়—আবার কি! অতখানি পথ নাচের ঢঙে হেঁটে অরুণ মেসে ফিরল। পরের দিন সন্ধ্যা হতে না হতে কর্মস্থলে।

ছিটে এলো ফোঁটা এলো, এবং বিন্দু বিসর্গ ফাউতুটোও পিছন পিছন দেখা দিল। আপন মনে ছবি দেখবে, গিন্নি বলেছিলেন—তেমনি পাত্রই বটে! জাতবিচ্ছু ও-তুটো—ছিটে ফোঁটার পড়া বলে দিচ্ছে, অ-আ'র বই এনে তার উপরে তু-পাশ দিয়ে ঝপ-ঝপ করে চেপে ধরল। এদেরই পড়াতে হবে আগে। একটুকু সরিয়ে দিয়েছে কি আর্তনাদ ও কাটা-কবুতরের মতো ছটফটানি। লোকে ভাববে, কী মারটাই না মারছে বাচ্চা তুটোকে!

রান্নার মাঝে ক্ষণে ক্ষণে এসে গিন্নি তদারকি করছেন। বলেন, পড়ে কি হবে, লেখাই আসল। মাস্টার তুমি অক্ষর লিখে দাও, তার উপর দাগা বুলোক।

এই একগণ্ডাতেই শেষ নয়, একটা তুটো দিন অন্তর নতুন নতুন আরও সব দেখা দিতে লাগল। ভাগনে ভাইঝি রকমারি পরিচয় দিয়ে গিন্নি এক একটাকে সতরঞ্চিতে বসিয়ে দিয়ে যান। কী সর্বনাশ! তুনিয়ার যেখানে যত কুটুম্ব আছে, বাড়ি এনে জমিয়েছে। ইতি পড়ে নি এখনো, আরও নাকি আসবে। ছোটখাটো ইস্কুল হয়ে উঠল যে দিনকে-দিন।

হোক তাই, আপত্তি কি! সন্ধ্যাবেলাটা পাবেন এঁরা, তার মধ্যে যেমন খুশি খাটিয়ে নিন।

এ তবু পড়ানো লেখানো আঁক-কষানো গল্প-বলা—সব কাজ একাসনে বসেই। যদি গিন্নি আদেশ করতেন, টবের গাছ ক'টায়

চাট্টি করে মাটি তুলে দাও মাস্টার, কিম্বা এক বালতি জল এনে দাও কল থেকে—করতে হত তাই। বলেন না, সেটা ভাগ্য। একটা জায়গায় বসে বসেই কাজকর্ম চলে।

এত করেও হল না। একটা ছোটখাট পরীক্ষায় ছিটে অঙ্কে পেয়ে গেল দশ। গিন্নি চোখ পাকিয়ে এসে পড়েন: দশ পায় কেন?

[গোল্লাই তো পাবার কথা। নির্ঘাৎ টুকেছে। বাহাদুর বটে আপনার ঐটুকু ছেলে!]

গিন্নির তর্জনগর্জন: কি রকম পড়াও তুমি?

[পড়াব কখন? আমি তো বাচ্চা রাখার রাখাল মাত্র। বিশ দিনে আজ ন'টায় এসে পৌঁচেছে। পুরো বছরে তবে তো একশচৌষট্টি পুরে গিয়ে তারও উপরে একটার ধড়-মুণ্ডের খানিক খানিক এসে যাবে। সোজা ত্রৈরাশিকের হিসাব।]

গিন্নির সিদ্ধান্ত: তোমায় দিয়ে চলবে না বাপু, অন্য মাস্টার দেখব। তুমি এসোগে।

তথাস্তু। দাদার বোঝা হালকা করবে মনে মনে আশা করে এসেছিল। চাকরি ধোপে টিকল না। তবু খানিকটা আরাম পায়। ন-নটা পশুপক্ষীকে সামাল দিতে জান বেরিয়ে যাচ্ছিল। আবার নাকি এক ভাগনে-বউ আসছে অর্ধেক ডজন ছেলেপুলে নিয়ে। এবার তো ঘরে ধরবে না—ছেলেপুলে নিয়ে মাস্টারকে ফুটপাথের উপর আসন নিতে হত।

গিন্নি বললেন, উনি নেই। পরশু-তরশু একদিন এসে মাইনে নিয়ে যেও।

পরশুও নয়, তার পরের দিন তক্কে তক্কে থেকে বাড়ি ফেরার মুখে কর্তাকে ধরে ফেলল। দুটো টাকা দিয়ে আবার তিনি পরশু আসতে বললেন। মাস দশেক লেগেছিল মাইনের পনের টাকা পুরোপুরি আদায় করতে।

শীতকাল। ভোরবেলা তুর-তুর করে কাঁপতে কাঁপতে ডোবার ঘাটে যশোদা বাসন মাজতে গেছেন। কুয়াশায় ঠাহর পাননি—নারকেলগুঁড়ির ঘাটে পা হড়কে পড়ে গেলেন। ঝন-ঝন করে বাসনকোসন ছড়িয়ে গেল, বিছানা ছেড়ে পূর্ণ ছুটে এসে পড়ল। ক্রমে এবাড়ি-ওবাড়ি থেকেও এলো, ডোবার কিনারে বেশ একটা সোরগোল।

যশোদা ক্রমাগত বলছেন, লাগে নি, কিচ্ছু হয় নি রে। কেন তোমরা ব্যস্ত হচ্ছ?

বলছেন বটে, কিছু নয়—উঠতেও পারেন না কিন্তু। উঠতে গিয়ে জল-কাদার মধ্যে গড়াগড়ি খেলেন। ধরে-পেড়ে সকলে ঘরে নিয়ে শুইয়ে দিল। পাড়ার একজনের মুষ্টিযোগ জানা আছে—কয়েক রকম শিকড়-বাকড় গরুর চোনায় বেটে হাঁটুতে জাব লাগিয়ে দিল: ব্যথা টেনে যাবে, চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। কতদিনে তা বলা যায় না। এই বয়সে এত বড় ঘা খেয়ে আগের মতন আবার খেটেখুটে বেড়াতে পারবেন, তাতে ঘোরতর সন্দেহ।

যাবতীয় ঝামেলা পূর্ণেন্দুকে পোহাতে হচ্ছে—মায়ের সেবাযত্ন, সংসারের রাঁধাবাড়া, জল তোলা, বাটনা বাটা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, সমস্ত। এরই মধ্যে আবার রোজগারের চেষ্টায় ছুটতে হয়। বাঁধা চাকরি নয়, সময়ের ঠিকঠিকানা নেই। কখন কি কৌশল ধরতে হবে, লহমা আগেও বোঝার উপায় নেই।

গুরুঠাকুর আত্মারাম আচার্য একই সঙ্গে পাকিস্তানের বাস ছেড়েছিলেন। ভিন্ন কলোনির তাঁরা, তা হলেও আচার্যিঠাকুরের বউ নিস্তারিণীর হামেশাই আসা-যাওয়া। ঠাকরুন বললেন, ছেলের বিয়ে দাও পুন্নর মা। যুগ্যি হয়েছে ছেলে, পয়সাকড়ি আনছে। সংসারের দায়ও এখন বটে। বেটাছেলের বাইরে বাইরে কাজ—আবার নিত্যিদিন ঘরও সে সামলাবে কেমন করে। নাকানি-চোবানি খাচ্ছে। ছেলে তোমার বড্ড ভাল, তাই কিছু বলে না।

মায়ের দুর্ঘটনার পর থেকে অরুণও যখন-তখন বাড়ি চলে আসে।

এসে দাদার ও মায়ের বকুনি খায়। পরীক্ষার মুখে ছুটোছুটির মানেটা কি? একটা দিন এখন যে এক এক মাসের সমান।

অরুণ কাতর হয়ে বলে, থাকি কেমন করে দাদা?

গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে পূর্ণেন্দু ভাইকে শান্ত করে। বলে, আমাদের সুখঅসুখ দেখতে হবে না, ভাল হয়ে পাশ কর তুই ভাইডি। পাশের খবর কানে শুনেই মা দেখবি নিরাময় হয়ে যাবেন।

তবু সে যায়। একবার গিয়ে শুনল, পূর্ণেন্দুর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। চেঁচিয়ে-লাফিয়ে আহ্লাদের বেগ সামলে নিল সে খানিক। প্রশ্ন করে: রাজি হল দাদা?

যশোদা বললেন, না হয়ে উপায় কি? আমি যে অচল হয়ে পড়লাম। ঘর-সংসার দেখতে গিয়ে রোজগার বন্ধ হচ্ছে। মাইনের লোকে সংসার চলে না, ভাল লোক মেলে না আজকাল। আর মেলেও যদি, মাসের পর মাস মাইনে কোত্থেকে টানব?

পূর্ণ বাড়ি ছিল না, খানিক পরে এলো। অরুণেন্দু বলে, সুমতি হয়েছে শুনলাম দাদা, আমার বউদিদি আনছ।

হেসে পূর্ণেন্দু বলে, বিনি-মাইনের সর্বক্ষণের ঝি—

কোন বউটা নয় শুনি? বড়লোকদের কথা আলাদা, আমাদের গরিবগুরোর ঘরে পটের-ছবি করে দেয়ালে টাঙানোর জন্য কেউ বউ আনে না।

দমে না অরুণ। বলছে, আমার মেসের একজন বোনের বিয়ের জন্য হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছেন। মেয়ে চোখেও দেখেছি, মায়ের সঙ্গে গঙ্গায় নাইতে এসে দুপুরবেলাটা মেসের ঘরে উঠেছিল। বেশ মেয়ে, বউদিদি হলে খাসা হবে। কথায় কথায় তোমার কথাও উঠে পড়েছিল। দেখ ভাই যদি পারো—বলে ভদ্রলোক হাত জড়িয়ে ধরলেন।

সত্যি বলছিস? চক্ষু কপালে তুলে পূর্ণ বলে, ভদ্রলোক পাগল না ক্ষ্যাপা? আমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া মানে তো হাত-পা বেঁধে গাঙে ছুঁড়ে দেওয়া বোনকে—

ক্রুদ্ধ হয়ে অরুণেন্দু বলে, ভাই তুমি আমার, সেটা ভুলো না। আত্মনিন্দা যত খুশি করতে পারতে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার দাদার যে নিন্দে হয়ে যাচ্ছে, সেটা আমি সহ্য করব না কিছুতে। শতেক রকম জিজ্ঞাসাবাদ করলেন ভদ্রলোক—তোমার চরিত্র চেহারা স্বাস্থ্য ঘরবাড়ি সংসারের খবরাখবর। সমস্ত বললাম। ঘর বলতে তালপাতার ছাপড়া, তা-ও গোপন করিনি। রোজগার কী রকম, আন্দাজ দিয়েছি। নিন্দের কথাও শুনিয়ে দিলাম: ইনিয়ে-বিনিয়ে নিজেকে ছোট করার স্বভাব তোমার। এত সমস্ত শুনেও তার পরে হাত জড়িয়ে ধরলেন।

মিটিমিটি হেসে পূর্ণেন্দু বলে, কোন কায়দায় রোজগার—তার কিছু বলেছিস?

জিজ্ঞাসা করেন নি, এমনি এমনি কেন বলতে যাব? ম্যাজিস্ট্রেট কি মিনিস্টার যদি হতে, দেমাক করে আগ বাড়িয়ে বলতাম।

পূর্ণ বলে, রক্ষে বলিস নি। শুনে মেয়ের ভাই চোঁচা দৌড় দিত।

অরুণেন্দু বলে, দিত না। যা করেছে, ঠিক এমনিটাই করত। দিনকাল কী দাঁড়িয়েছে, শহরের উপর নিত্যিদিন চোখে দেখি। টাকা হলেই হল, টাকাটা কী করে আসছে কেউ জানতে চায় না।

জোর দিয়ে আবার বলে, বেশ তো, পরখ হয়ে যাক। গ্রীন-সিগন্যাল দিয়ে দাও তুমি, পাকা কথাবার্তার আগে সমস্ত-কিছু খুলে বলব। তবু সম্বন্ধ বাতিল হবে না, দেখো।

পূর্ণেন্দু বলে, ভাই না-হয় দায় নামিয়ে বাঁচবেন। কিন্তু আমাদের দুঃখের সংসারে বোন তো শান্তি পাবে না। নিজে জ্বলবে, আমাদেরও জ্বালাবে।

অরুণ বলে, বুঝলাম দাদা, অন্য কোথায় পছন্দ করে ফেলেছ। নয়তো এত ফ্যাকড়া তুলবে কেন? পছন্দের সেই মেয়ে জ্বলতে জানে না বুঝি?

হেসে পূর্ণেন্দু ঘাড় নাড়ল: না, বর্তে যাবে। তারা আমাদের চেয়েও দুঃখী।

অরুণেন্দু অবাক হয়ে বলে, আছে কেউ এমন?

এত কথা মা বলেছেন, পাত্রীর খবরটাই বলেন নি? তিনকড়ি হালদারের মেয়ে মলিনা। জলার ধারে বটগাছতলায় যারা ঘর তুলেছে। মলিনা বউ হয়ে আসছে।

নিঃসাড় অরুণেন্দু, বজ্রাহতের মতন।

হল কি রে? পূর্ণেন্দু হি-হি করে হাসে: ঘেয়ো-কাঁঠালের মুচি খদ্দের। কাঁঠাল খুঁতো না হলে আমা হেন খদ্দের অবধি পৌছবে কেন? আমার ভাতভিত্তি জানে তারা, জেনেশুনেই আগ্রহ করছে। গরিবঘরের কালোকুচ্ছিত মেয়ে—

অরুণ জুড়ে দেয়: তার উপরে গন্নাকাটা—কথার আওয়াজে মানুষ হাসে।

তা হাসুক। সে মেয়েরও সাধ-আহ্লাদ থাকে—ঘর-গৃহস্থালীর সাধ, স্বামী-শাশুড়ি-দেওর পাবার সাধ। মায়ের সেবা বেশি করে করবে মলিনা, সংসারের বেশি যত্ন নেবে।

প্রবোধ দিয়ে বলে, বেজার হোস নে ভাইডি। মায়ের সঙ্গেও এই নিয়ে লড়ালড়ি হয়েছে। তোর সাধ মায়ের সাধ সমস্ত তোর বউ এনে মেটাব। পাশ করে চাকরি-বাকরি করবি তুই, ভাল ঘরবাড়ি হবে, ঘর আলো-করা বউ নিয়ে আসব তখন।

অরুণ হেসে বলে, বউ দিয়ে আলো করার দরকার নেই—হেরিকেনে বেশ চলছে। চাকরি জুটিয়ে সকলের আগে তোমার বৃত্তি ঘোচাব। একটা-কিছু এদ্দিনে নিশ্চয় জোটাতাম। কিন্তু তুমি যে পড়াশুনোর গোঁ ধরে বসলে। দেশের সব ছেলেই যেন বি-এ পাশ! গ্র্যাজুয়েট না হলে যেন মানুষ হয় না!

পরীক্ষা দিয়ে অরুণেন্দু বাড়ি এসেছে। এইবারে পূর্ণর বিয়ে। অরুণের জন্যে আটকে ছিল এতদিন।

অতি সংক্ষিপ্ত আয়োজন। দুই ভাই এবং মা শুধু জানেন। আর ওপক্ষে খবর রাখে কনের বৈমাত্রেয় ভাই, আরও একজন

দু-জন। এবং কনেও সম্ভবত।

সেদিনটা পূর্ণেন্দুর কাজকর্ম কামাই গেল—স্বাধীন জীবিকা, কারো কাছে কৈফিয়তের দায় নেই, সেই বড় সুবিধা। প্রহরখানেক রাত্রে দুই ভাই এবং পুরুতঠাকুর মশায় আমতলা বটতলা পার হয়ে মাঠ ভেঙে কনের বাড়ি চললেন। দেহের কোনখানে রক্তপাত হলে শুভকর্মে বিঘ্ন ঘটে—পুরুতঠাকুর পই-পই করে বললেন, বরের জন্য অন্তত একটা পালকি নিয়ে নাও। কিন্তু পূর্ণেন্দু বেঁকে বসল: না। শুধু আমি কেন, নতুন বউকেও কাল পায়ে হেঁটে শ্বশুরবাড়ি উঠতে হবে।

পালকি হয় নি, একজোড়া ঢোলকাঁসিও নেই—অরুণেন্দু আগে আগে হেরিকেনের আলো দেখিয়ে যাচ্ছে মেঠো পথে আছাড় খেয়ে না পড়ে যাতে বর। পড়বে না অবশ্য—এ কর্মে বরের সাতিশয় দক্ষতা। এর চেয়ে ঢের ঢের গুরুতর স্থলে তার বিচরণ—একচুল এদিক-ওদিক হলে, রক্তপাত কি—দেহখানি তালগোল পাকিয়ে পিণ্ডবৎ হয়ে যাবে। সেই বিচরণ নিত্যিদিন হরবখত করে যাচ্ছে—সামান্য একটা মাঠ ও কিছু খানাখন্দ পার হওয়া নিয়ে ঘাবড়ানোর কী আছে! হেরিকেন নিতেও আপত্তি ছিল—কিন্তু ভাই নিতান্ত নাছোড়বান্দা হয়ে পড়ায় কেরোসিনের অপব্যয়টা মেনে নিতে হল।

বিয়ে সামান্যেই সমাধা—দুই টাকা দক্ষিণায় পুরুত কি আর রাতভোর মন্তোর পড়িয়ে যাবেন! কাজকর্ম সেরে পুরুত আর অরুণ সেই রাত্রেই ফেরত চলে এলো। কনে-বাড়িতে স্থানাভাব—নতুন-জামাইকে নেহাত রাতারাতি বিদায় করা চলে না, কষ্টেসৃষ্টে তার থাকার মতন ব্যবস্থা হয়েছে। কাল দিনমানে বর-বউ হেঁটে বাড়ি আসবে। গন্নাকাটা বউয়ের ঠোঁটের খানিকটা কাটা বটে, কিন্তু পা দুখানা ষোলআনা নিখুঁত। স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে আসবে দেখো।

॥ চার ॥

পাশ করেছে অরুণেন্দু, টায়েটোয়ে পাশ। তাতেই পূর্ণেন্দু মহাখুশি। আকাট মূর্খের ভাই গ্রাজুয়েট—এঁটোপাতের খোঁয়া সত্যি সত্যি স্বর্গে পৌঁছল তবে! ইচ্ছে মতন চাকরিবাকরি নিয়ে নিক এবারে, নিজের মা-ভাই শুধু কেন—দশের প্রতিপালক হয়ে নাম-কাম করুক। বুকে মাটি ঠেকে গেছে খরচ জোগাতে। অরুণ নিজেও বিস্তর কষ্ট করেছে। ট্যুইশানি করেছে, খবরের কাগজের হকারি ক'রেছে, খাতা-পেন্সিল বিক্রি করে বেড়িয়েছে ইস্কুলে ইস্কুলে—যখন যেটা কায়দামতন জুটে যায়।

যাই হোক, অরুণেন্দু ভদ্র বি-এ—বুক ফুলিয়ে লিখুক এবার থেকে। যেখানে তাদের পৈতৃক বাড়ি (এখন পাকিস্তান), তল্লাট কুড়িয়ে তথায় চারটি মাত্র গ্রাজুয়েট ছিল। কী খাতির-সম্মান সেই চারজনের! সামান্য ঘরোয়া কথাবার্তাও লোকে তটস্থ হয়ে শুনত, না-জানি কোন পাণ্ডিত্য তার মধ্যে ঝলক দিয়ে ওঠে! অরুণও আজ সেই দুর্লভ দলের একজন—যশোদা বেওয়ার ছেলে পূর্ণেন্দু ভদ্রের ভাই যে অরুণ। গাছ তৈরি হয়ে গেছে—ফল কুড়ানো এইবার।

নতুন বউ মলিনা গোড়ায় গোড়ায় কথা বলত না অরুণেন্দুর সঙ্গে, মাথায় লম্বা ঘোমটা টেনে সরে যেত। যশোদা বলতেন, একি বউমা, কাজে কর্মে পুত্র তো সর্বক্ষণ বাইরে, আমি বিছানায় পড়ে আছি, ছেলেটা বাড়ি এসে কথার দোসর পায় না। আসবেই না আর, এমনিধারা যদি মুখ ঘুরিয়ে থাক।

পূর্ণেন্দু এলে তার কাছেও বউয়ের নামে বলেন। ভর্ৎসনা করে সে মলিনাকে: কী বিদঘুটে লজ্জা তোমার! বলি নিজের ভাইয়ের কথা বলো না? মেসে পড়ে থাকে। বাড়ি আসে আপনজনের আর একটু যত্নআত্তি পাবে দুটো মিষ্টি কথা শুনবে, সেই আশায়।

এর পরে আছে অরুণেন্দু নিজে। নাছোড়বান্দা হয়ে তাড়া করে মলিনাকে, 'বউদি' 'বউদি' করে চেঁচিয়ে বাড়ি মাত করে। শাশুড়ির বকুনি তদুপরি স্বামীর ক্রোধ—আজ মলিনা দেওরের ডাকে ছুটে পালায় না, মাথায় আধ-ঘোমটা দিয়ে চুপচাপ সে দাঁড়িয়ে পড়ল। পায়ের নখে মাটিতে দাগ কাটছে।

কাছে এসে গম্ভীর কণ্ঠে অরুণ বলে, কথা বলেন না আপনি আমার সঙ্গে। ডাকলে সাড়া দেন না, অগ্রাহ্য করে চলে যান। সাহসটা কী আপনার—জানেন, আমি কে ?

ভীত দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখে মলিনা চোখ নিচু করল।

অরুণ বলে, নতুন এসেছেন, জানেন না তাই। আমি সম্রাট। আমায় নিয়ে বাড়িসুদ্ধ ব্যতিব্যস্ত। তক্তাপোশের উপরে রাজশয্যা আমার জন্য। যে ক'টা বালিশ-তোষক আছে সবগুলো সেই তক্তা-পোশে উঠে যায়—অন্য সকলের মাটির মেজেয় মাদুরের উপর শোওয়া। জেলেপাড়া ঘুরে ঘুরে সবচেয়ে মোটা গলদাচিংড়ি আসবে যেহেতু চিংড়িমাছ আমি খাই ভালো। দুধ কেনা হবে—মা বুড়ো-মানুষ কিম্বা দাদা এত খাটনি খেটে বেড়ায়, কেউ তা থেকে একফোঁটা পাবে না, সমস্তটুকু আমার। সর খাবো, ক্ষীর খাবো—

মলিনা কথা বলল। মৃদুস্বরে বলে, পড়াশুনো করেন যে আপনি—

মলিনার লজ্জা বটে—সেকেলে বউরা যা করত, সে জাতীয় লজ্জা নয় বোঝা গেল। গন্নাকাটা মুখে কথা উচ্চারণের লজ্জা—চেপে চেপে অতিশয় ধীর কণ্ঠে বলছে। বাপের-বাড়ি তার কথা শুনে লোকে হাসে, স্বরের অনুকরণ করে ভেংচায়। শ্বশুরবাড়িতেও সেই অবস্থা না ঘটে—মলিনা অতি-সতর্ক তাই।

বলল, পড়াশুনোয় মাথার খাটনি। ভালমন্দ খেতে হবে বইকি ঠাকুরপো।

সে পাট চুকেছে। পড়ুয়া নই এখন, পাশ-করা গ্রাজুয়েট।

প্রচণ্ড হাস্যে অরুণ নিজের বুকে একটা থাবা মারল : পাশ-টাস

করে বিত্তের চূড়োর উপর বসেছি। রকমারি চাকরি সব পায়ের নিচে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে, তুলে নিলেই হল। নিই নি এখনো—নজর ফেলে ফেলে বিবেচনায় আছি। চাকরি নিয়েই এই জমিটার উপর দোমহলা অট্টালিকা তুলে ফেলব, সামনের ঐ শেয়াকুলের জঙ্গলে দেউড়ি আর ঘড়িঘর। আমার বউদির আপাদমস্তক সোনায় হীরেয় মুড়ে দেবো, তা-ও ঠিক করে রেখেছি। রেলের কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে দাদা বাড়িতে গদিনসিন হয়ে এস্টেটপত্তোর দেখবে। প্লান একেবারে নিখুঁত করে ছকে রেখেছি।

মলিনা হেসে সতর্ক মৃদু কণ্ঠে বলল, আর একটি তো বললেন না। আমার যে বোন হয়ে আসবে—

অরুণেন্দু সায় দিয়ে বলল, সত্যি, বড্ড মনে করিয়ে দিলেন। চাকরির মতন বউও পছন্দ করার ব্যাপার। দাদাকে হুঁশ করিয়ে দেবেন তো বউদি, দেখাশুনো দরদাম আরম্ভ করে দিন।

নিভৃতে মায়ের কাছে অরুণেন্দুর ভিন্ন মূর্তি : মাগো, বউ সামলাও তোমার। আদরযত্নের ঠেলায় মারা পড়ি।

বলে, বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় পড়তে গেলাম, সেই থেকে গোলমালের শুরু। তোমার ছেলে নই যেন আর আমি, দাদার ভাই নই। কলকাতা থেকে বাড়ি আসি—দেবলোক থেকে নরমূর্তি ধরে এসেছি যেন। তবু সে যা-হোক করে চলছিল, এবারে পরের মেয়ে যাঁকে বউ করে এনেছ, তিনি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

যশোদা বিশেষ আমল না দিয়ে বললেন, পুন্ন বলে দিয়েছে।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে অরুণ বলে, সেই তো জিজ্ঞাসা। কেন দাদা আলাদা করে বলতে যাবে ?

না বললে পরের মেয়ে জানবে কেমন করে ? এবাড়ির তুই যে আশাভরসা—সকলে মুখ চেয়ে আছে।

ছ-মাস তো হয়ে গেল। এর মধ্যে ভরসার কতখানি কি পেয়ে

শুনি? কোন আশাটা তোমাদের পূরণ করেছি? যেখানে যাচ্ছি, দরজা বন্ধ। অপদার্থ আমি—কাজকর্ম যারা দেয়, তাদের হদিস বের করতে পারি নে।

একটু থেমে বিষণ্ণ তিক্তকণ্ঠে সে বলল, বউদিকে দাদা কি বলেছে জানি নে—তুমি বলে দিও মা, থালায় ভাত না দিয়ে আমার জন্য উনুনের ছাই বেড়ে দেন যেন।

যশোদা আহা-আহা করে উঠলেন: কী রকম কথার ছিরি—ছ-মাস গেছে তো কী হয়েছে! আস্তকাল পড়ে রয়েছে—কত রোজগারপত্তোর করবি, সুখশান্তি হবে। এত কষ্টের বিদ্যে বিফল যাবে না।

মা-জননীর প্রত্যয়ে চিড় খায় না। অজ পাড়াগাঁয়ে জীবন কাটিয়ে এসেছেন—ছেলে গ্রাজুয়েট হয়েছে, সেই দেমাকে মটমট করছেন। সে যখন ছিল, তখন ছিল। গ্রাজুয়েট ঝাড়ুদার হয়েছে, খুঁজলে আজকের দিনে তা-ও হয়তো মিলে যাবে।

কথাগুলো মুখে এসে পড়েছিল, অরুণেন্দু চেপে নিল। কতদিনই বা আছেন আর—আশা চুরমার করে দেওয়া নিষ্ঠুরতা। মৃত্যু অবধি আশা আঁকড়ে ধরে চলে যান।

মায়ের কথা শুনে অরুণেন্দু হাসল এবার, জবাব দিল না।

যশোদা বললেন, সময়টা খারাপ যাচ্ছে তোর, ঠিকুজি বলছে। ঠাকুরটি বক্রি, বারের পুজো তাই হপ্তায় হপ্তায় দিয়ে যাচ্ছি। তার উপরে নারায়ণের বুকে-পিঠে নিত্যিদিন তুলসী পড়ছে। চাকরি শিগগিরই হবে দেখিস।

বারের পুজো মানে শনিবারের পুজো, ঠাকুর এখানে শনিঠাকুর। বেয়াড়া ঠাকুর শনি, স্পষ্টাস্পষ্টি নাম ধরতে নেই, ঠারেঠোরে বলতে হয়।

তা বেশ হয়েছে। নিজে সে চেষ্টাচরিত্র করছে—শয্যাশ্রয়ী হয়েও মা-জননী এদিকে নিশ্চিন্ত নেই। অফিসের উপরওয়ালাদের কষে অরুণ ধরাপাড়া করুক, সেই উপরওয়ালাদের উপরে যাঁরা

তাঁদের তদ্বিরে মা-জননী আছেন। চাকরি না হয়ে যাবে কোথায়?

এক বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন, অতিশয় সদয় কণ্ঠ: বাবা তোমার নাম?

নাম বলল অরুণেন্দু।

কোথায় থাকা হয়?

সেটা বলি নে, মাপ করবেন। মোকামে কেউ গিয়ে হাজির হবেন, সে আমি চাই নে। সজ্জনদের নরকদর্শন করিয়ে পাপের ভাগী হই কেন? তবে চিঠিপত্রের ঠিকানা থাকে: মির্জাপুর স্ট্রীটের আর্য হোটেল।

এর পরে স্বভাবতই যে প্রশ্ন আসে: বাবাজির কী করা হয়?

উমেদারি—

বেশ, বেশ! বৃদ্ধ হেসে পড়লেন: হাসি-খুশি ছেলে তুমি—কথায় কথায় ঠাট্টাতামাশা।

সবিনয়ে অরুণ বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠাট্টাতামাশায় জীবনকে উড়িয়ে দেওয়া।

জয়ন্ত ইস্কুলের বন্ধু। পাশ দিলেই মন চনমন করে, দিগ্‌গজ একটা-কিছু হবো। যথারীতি ভর্তি হয়ে গেল গোবরডাঙা কলেজে। মাস দুই-তিন পরে ইস্তফা দিল—চালাক ছেলে, দিবাজ্ঞান তাড়াতাড়ি এসে গেছে। দরজায় দরজায় মাথা খুড়ে বেড়ানোই নিয়তি—পাশ করলেই বা কি না-করলেই বা কি! পাশ করেছি বলে খাতির দেখিয়ে কেউ 'এসো' 'এসো' করবে না। কী দরকার তবে ঝামেলা বাড়ানো ও সময়ক্ষেপ করার? অরুণেন্দুর মতন দাদা-টাদা ছিল না ভাইকে গ্রাজুয়েট বানাতে যে মরণপণ নিয়েছে! প্রেসিডেন্সি কলেজে অরুণ তিন তিনটে বছর জুড়ে ঘাস কাটতে লাগল, জয়ন্ত সে সময়টা তদ্বিরশাস্ত্রে হাতে-কলমে রকমারি পাঠ নিয়েছে।

বলে, ঘুস বিনে কাজ হয় না। দুনিয়ায় সবাই ঘুস খায়। কাকে কোন ঘুস কি কায়দায় দিতে হবে, সেই হল বিবেচনা।

অরুণেন্দু গড়গড় করে কতকগুলো মহা-মহা ব্যক্তির নাম করে গেল: এঁরা?

তুচ্ছ মানুষ তো ওঁরা। স্বর্গধামের তা-বড় তা-বড় দেবদেবীও দস্তুরমতো ঘুসেল। মন্তোর পড়ে পুজো করি: তুমি হেনো, তুমি তেনো—সে তো নির্জলা খোশামুদি। মামলাটা জিতিয়ে দাও, ঢাক-ঢোল-পাঁঠায় পুজো দেবো—সোজাসুজি এগ্রিমেন্ট, স্ট্যাম্প-কাগজে লেখা নেই এই যা।

তর্ক ছাড়ে না অরুণ। নাম ধরে ধরে বলছে: অমুক ঘুস নেন?

টাকাপয়সা কক্ষনো নেবেন না। দাবায় বসতে হবে, বসে হারতে হবে। খেলা যতবারই হোক, তুমি জিততে পাবে না।

আচ্ছা, তমুক?

মাথার চুল খাটো করে ছেঁটে হাঁটু অবধি গুনচট পরে খালি-পায়ে ওঁর কাছে যাবে। গিয়েই এক ফেটি সুতো গলায় পরিয়ে দেবে, তকলিতে নিজের হাতে-কাটা পরিচয় দিয়ে।

ইত্যাদি অনেক কথা। মুগ্ধ হয়ে অরুণেন্দু বলে, অগাধ তোর জানাশোনা—এ শাস্ত্রের মহামহোপাধ্যায় তুই। কোন কায়দায় আমি এগোব, কিছু হদিস দিয়ে দে ভাই।

কিছু না, কিছু না। জয়ন্ত ঘাড় নাড়ল: থিয়োরি যৎকিঞ্চিৎ জানলেও কাজে নেমে খুব একটা মুনাফা দেয় না। এই করলে এই হবে—ছক-বাঁধা নিয়ম নেই কিছু। ঝোপ বুঝে কোপ। জেনে বুঝে আমারই বা কী হয়েছে বল। দুত্তোর—বলে শেষটা দোকানের কাজ নিয়ে নিতে হল।

জোরে এক নিশ্বাস ফেলে আবার বলে, এমন তুখোড় জয়ন্ত চৌধুরি—গোলদারি দোকানের দাড়িপাল্লা-ধারী হয়ে আছেন তিনি। থিয়োরিতে হয় না, বুঝলি রে, প্রতিভা আবশ্যক। খোশামুদি বড়

কঠিন জিনিষ—মানুষের রকমারি মনমেজাজ। একই কথায় কেউ গলে গদগদ হয়, কেউ বা তিড়িং করে তেরিয়া হয়ে ওঠে।

জয়ন্তর বেলাতেও ঠিক এই ঘটেছিল। 'আপনি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ, বিস্তর জন ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে থাকে' ইত্যাদি শুনে একজনে 'বসুন' 'বসুন' বলে খাতির করলেন। 'আপনার কথার বাঁধন তো খাসা'—বলে চায়ের হুকুমও দিয়েছিলেন তিনি। ঠিক ঐ কথাগুলোর প্রয়োগে অন্য-একজনে 'ইয়াকি?' বলে গর্জে উঠলেন। শেষোক্ত জন যেহেতু গায়ে-গতরে ভারী, বিশেষণগুলোকে তিনি ইয়ার্কি বিবেচনা করেছেন।

পাড়ায় একটা লাইব্রেরি আছে। দুপুর দুটো থেকে রাত আটটা অবধি খোলা। নিত্যিদিন অরুণ যাবেই একবার সেখানে, যতগুলো কাগজ আছে উল্টেপাল্টে দেখবে। কলেজ স্ট্রীটে তিনটে ট্রাম ও সাতখানা বাস পুড়িয়েছে, কোন পানের দোকানে পান-বিড়ির সঙ্গে বোমা বিক্রিও ধরা পড়েছে, উজ্জ্বলমুখ দেবকিশোরের মতো দুটো ছেলে গুলিবিদ্ধ করে পথের পাশে ফেলে রেখে গেছে, কোন সুন্দরী যুবতীকে বঁটি পেড়ে চাক-চাক করে কেটেছে নাকি কোথায় ইত্যাদি ইত্যাদি রোমহর্ষক খবর। টেবিলে কাগজ পড়তে পায় না, এর হাত থেকে ওর হাতে ঘুরছে।

তারই মধ্যে অরুণ গিয়ে পড়ে: দেখি—

আমাদের দেখাটা হয়ে যাক, তারপরে। খামোকা টানাটানি করবেন না।

অরুণ বলে, তা কেন। আপনারা খবর পড়ুন—আমার উল্টো পিঠ, কর্মখালির পাতা। খবরে আমার গরজ নেই, কয়েকটা ঠিকানা কেবল টুকে নিয়ে যাচ্ছি।

অন্যেরা অবাক হয়ে তাকায়। কোথাকার সন্ন্যাসী-ফকির এলো—দুনিয়া জুড়ে এত সোরগোল, মানুষটির মাথাব্যথা নেই।

অরুণ বলে, চাকরি দিতে পারেন তাঁরাই শুধুমাত্র আমার দুনিয়া। অন্যদের জানি নে।

মোটা খাতা বেঁধে ঘর-ঘর ভাগ করে নিয়েছে। বিজ্ঞাপনদাতার নাম-ঠিকানা, চাকরির বিবরণ, মাইনে, দরখাস্ত পাঠানোর শেষ তারিখ ইত্যাদি। দিনে রাত্রে এতটুকু বসতে পারলেই মুশাবিদায় লেগে যায়। ধরে ধরে মুক্তার মতন অক্ষরে দরখাস্ত লেখে। দরখাস্ত ডাকে ছেড়ে খাতায় যথাস্থানে তারিখ দেয়, যদি জবাব এসে যায় চুম্বক টুকে রাখে। দস্তুরমতো এক ডিপার্টমেণ্ট চালিয়ে যাচ্ছে—বিশাল খাতাখানায় উমেদারি-জীবনের অধ্যবসায়ের পরিচয়-চিহ্ন। সে যে কী সাংঘাতিক ব্যাপার, একটিমাত্র নজরেই মালুম হয়ে যাবে।

জবাবের আশা করে দরখাস্তের সঙ্গে গোড়ায় গোড়ায় স্ট্যাম্প পাঠাত। কাকস্য পরিবেদনা! স্ট্যাম্প বিলকুল মেরে দেয়। জ্ঞান লাভ করে অতঃপর স্ট্যাম্প পাঠানো বন্ধ করল। দশ-বিশখানা করে প্রতিদিন শুখো-দরখাস্ত ছেড়ে যাচ্ছে। একবেলা ভাত খায়, আর একবেলা প্রাণ ভরে রাস্তায় বিনামূল্যে জল খেয়ে সেই পয়সায় দরখাস্তের ডাকটিকিট কেনে।

জয়ন্ত বলে, দরখাস্তে কী হবে রে! মিছে উপোস দিয়ে মরছিস। বিজ্ঞাপন দেয় বুঝি চাকরি দেবার জন্যে? মানুষ তো আগেই ঠিক হয়ে থাকে—ওটা রেওয়াজ। বিজ্ঞাপনের নামে খবরের-কাগজদের কিছু কিছু প্রণামী দিতে হয়।

দরখাস্ত এর পরে বিনি-টিকিটে বেয়ারিং-পোস্টে ছাড়ছে। মন বোঝে না, পাঠিয়ে যাওয়া। আর্য হোটেলের ম্যানেজারের কাছে খবর পাওয়া যায়, আটখানা খাম ফেরত এসেছিল। কোনদিন বা বলে, আজকে দশখানা। পিওন এসে খোঁজাখুঁজি করে: কোথায় অরুণেন্দুবাবু, ডবল চার্জ দিয়ে ফেরত নেবেন বেয়ারিং-চিঠি। ম্যানেজারকে শেখানো আছে, সে উড়িয়ে দেয়: অরুণেন্দু বলে কেউ হোটেলে থাকে না, ও-নামের কোন লোক জানা নেই।

দরখাস্ত লিখে লিখে আঙুলে ব্যথা—ডাকের দরখাস্তে কিছু হয় না, বহুদর্শী জয়ন্ত ঠিক কথাই বলে। বিধাতা পা নামক যুগল-যন্ত্র দিয়েছেন, সেই বস্তু অতএব হদ্দমুদ্দ চালিয়ে দেখ। অফিস-

পাড়ায় রাস্তা ধরে ধরে হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে, লেন-বাইলেনও বাদ থাকবে না। হাতে দরখাস্ত নিয়ে দোর ঠেলে সটান একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়া—যে কায়দায় একদা ট্যুইশানি খুঁজত। আন্দাজি ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে লক্ষ্যে ভাগ্যক্রমে লেগেও তো যেতে পারে।

ইতিমধ্যে চাঁদমোহন বলে একজনের সঙ্গে ভাবসাব হয়েছে। চাখানা চালায় সে, নিজ নামে চাখানার নাম—চাঁদমোহন-কেবিন। ঘোরতর আড্ডাধারী মানুষ—জয়ন্তদের দোকানের খদ্দের।

পিছনের ছোট ঘরটায় চাঁদমোহন শোয়, সেইখানে জয়ন্ত একদিন অরুণকে নিয়ে গেল। বলে, কাজের কথা আগে সেরে নিই। অরুণের চাকরি না হওয়া পর্যন্ত শোবার জন্য মেঝের উপর একটু জায়গা এবং স্যুটকেশ ও উমেদারি-খাতার জন্য তাকের উপর সামান্য একটু জায়গার আবশ্যক।

চাঁদমোহন ঘাড় নেড়ে দেয়ঃ চলে আসুন, চারজনে শুই—চারের জায়গায় পাঁচ হলাম, এ আর বেশি কথা কী!

দুম করে তার ঘাড়ে এক ঘুসি। ঘুসি মেরে জয়ন্ত বলে, 'চলে আসুন' কি রে—গুরুঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিস? 'চলে আয়' বলবি, পয়লা দিন 'চলে এসো'তে না-হয় রফা করা গেল।

চাঁদমোহন বলে, ওই চেহারা তায় অত বিদ্যে—বেরুতে চায় না মুখ দিয়ে, জিভে আটকে আটকে যাচ্ছে।

অশেষ অধ্যবসায়ে তারপরে যেন মুখ থেকে ধাক্কা দিয়ে 'তুমি' বের করে দিলঃ কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে তুমি যাবেই। সেদিন চাঁদমোহন-কেবিনকে ভুলে যেও না, লুকিয়েচুরিয়ে এসো এক-আধবার।

পয়লা দিনের কথাবার্তা এই। মাস দুই-তিনের মধ্যে অরুণেন্দু নিদারুণ রকম জমিয়ে তুলল। চাঁদমোহন বলে, কোন শালা বলবে যে তুই বিদ্বান।

সত্যি?

উল্লাসে দু-পাটি দাঁত মেলে অরুণেন্দু বলে, আরও একবার বল্ ভাই, ভাল করে শুনে নিই। শুনে ভরসা আসুক।

আড্ডায় জয়ন্তকে একদিন হাজির পেয়ে বলল, চাঁদমোহন কি বলছে স্বকর্ণে শুনে নে। এর পরেও বিদ্যের খোঁটা দিবি তো ধড় থেকে মুণ্ডু মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলব।

চতুর্দিকে একবার নজর ফেলে সগর্বে অরুণ বলছে, 'ক'-লিখতে কলম ভাঙে, আমি তাদেরই একজন—কথাবার্তার ঢঙে তেমনি নাকি মালুম হয়। পেটের মধ্যে ডুবুরি নামিয়েও নাকি এক কাঁচ্চা বিদ্যের হদিস পাওয়া যাবে না। চাঁদমোহনের তাই অভিমত।

চাঁদমোহন ঘাড় নেড়ে সায় দেয়ঃ হ্যাঁ, সত্যি—

রেগে জয়ন্ত বলে, সত্যি কখনো বলেছিস তুই জীবনে?

বিশ্বাস করবি নে, কিন্তু বলে থাকি অবরে-সবরে। অরুণকে নিয়ে এই একটা যেমন বললাম। মুখ ফসকে সত্যি হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে, ঠেকানো যায় না।

জোর দিয়ে চাঁদমোহন আবার বলল, অরুণের বিদ্যে আছে সেটা মিথ্যে। আরও জবর মিথ্যে, অরুণের চাকরি-বাকরি নেই। বেকারের এত রংতামাসা ফুর্তিফার্তি আসে না।

পিছনে একটু ব্যাপার আছে, জয়ন্তকে এত সব শোনানো সেই জন্য। দাঁড়িপাল্লা ধরে জয়ন্ত মাল মাপামাপি করে বটে, তা বলে নিতান্ত হ্যাক-থু চাকরি নয়। রীতিমতো দু-পয়সা আছে। মালিক না হয়েও দোকানের সর্বেসর্বা সে এখন। লড়াইয়ের আমল থেকে সরল পথের ব্যাপার-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ। মালিকমশায় ভীতু লোক—কখন পুলিশ এসে পড়ে হাতে-দড়ি দেয়, সেই ভয়ে দোকানের ধারেকাছেও আসেন না। জয়ন্তকে বাড়ি গিয়ে হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হয়। মালিক প্রতিদিন সেই সময় ধর্ম স্মরিয়ে দেনঃ ভেজাল দাও আর মজুত মাল সরিয়ে রাখো, অধর্ম কোরো না বাপু। মালিকের পাওনাগণ্ডার তঞ্চকতা না হয়।

অর্থাৎ জেলে যাওয়ার মধ্যে নেই, মুনাফার বেলা আছেন তিনি।

তাই সই—চুটিয়ে জয়ন্ত কাজ-কারবার চালাচ্ছে।

অরুণেন্দু প্রলুব্ধ কণ্ঠে বলে, দোকানের কাজকর্ম আমায় একটা জুটিয়ে দে ভাই।

জয়ন্ত এককথায় উড়িয়ে দেয়ঃ তোর হবে না।

কেন, কি অপরাধ করলাম?

মুখ বেজার করে জয়ন্ত বলল, এক গাদা লেখাপড়া শিখে ফেলেছিস—আমি কি করব?

লেখাপড়া তো গায়ে লেখা থাকে না—

তোর আছে। মুখে বিদ্যের জ্যোতি ফুটে বেরোয়, বিদ্যের গন্ধ গায়ে ভুরভুর করে। চেহারাতেও বলছে, মস্ত দরের মানুষ তুই। এই মানুষ সের-বাটখারা নিয়ে ব্লাকের ময়দা মাপছিস—খদ্দের এগোবেই না কেউ। হোমরা-চোমরা কেউ ছদ্মবেশে ফাঁদ পেতেছে, ধরে নেবে।

বিপন্ন ভাবে অরুণেন্দু বলল, মুশকিল! আচ্ছা, কালো মুখে এটা-ওটা মেখে এন্তার তো সুন্দর হয়ে যায়—ওর উল্টো কিছু বাজারে নেই যা-সমস্ত মেখে ভালো চেহারার মানুষ উৎকট হয়ে যায়?

ভেবেচিন্তে জয়ন্তর তেমন-কিছু মনে পড়ল না।

এতদিন পরে অবশেষে চাঁদমোহনের সাফাই-সাক্ষি মিলে গেল। দিব্যি-দিশেলা করে সে বলছে, বিদ্যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে চেহারা থেকে। বাইরের চেহারায় চিহ্নমাত্র নেই, এমন কি পেটের ভিতরে তল্লাস করেও নাকি পাওয়া যাবে না।

সগর্বে সবিশেষ শুনিয়ে অরুণেন্দু বলে, এখন? এবারে কি বলে কাটান দিবি?

প্রাণের বন্ধু জয়ন্ত, কাটান কেন সে দিতে যাবে! মালিকমশায়কে ধরে একটুকু জুটিয়েছেও সে ইতিমধ্যে। ইনকামট্যাক্সের খাতা লেখার কাজ। খতিয়ান জাবেদাখাতা ইত্যাদি গোমস্তা দোকানের গদিতে বসে হাতবাক্সর উপর রেখে লেখে। এ জিনিষ একেবারে

আলাদা, মালিকের ভিতর-বাড়ি চোরকুঠুরির ভিতর এর লেখার জায়গা।

ল্যাজামুড়ি এবং পাতায় পাতায় মিল রেখে কল্পনার খেল দেখাতে হয়। আমার এই গল্প-রচনারই রকমফের আর কি! পাঠকেরা মুকিয়ে আছেন—পান থেকে চুন খসলে ক্যাঁক করে টুঁটি চেপে ধরবেন। ওঁদের বেলাতেও তেমনি। ইনকামট্যাক্সের কর্তারা তিল পরিমাণ গরমিলে গোড়া ধরে টান মারবেন। দায়িত্বের ব্যাপার—অতিশয় বিশ্বাসী লোকের প্রয়োজন। জয়ন্ত এক সন্ধ্যায় মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে অরুণকে চোরকুঠুরিতে বসিয়ে দিয়ে এলো।

চাঁদমোহনের সঙ্গে শোওয়ার ব্যবস্থা—খাওয়ার খরচারও এক রকম সঙ্কুলান হয়ে গেল। আবার কি—অহর্নিশি এবারে লেগে পড়ো চাকরি খোঁজার কাজে।

॥ পাঁচ ॥

সুইংডোর ঠেলে অরুণেন্দু ভিতরে ঢুকল। ভদ্রলোক টেবিলে পা তুলে ঘুরন-চেয়ারে কাত হয়ে পড়ে আঙুলের নখ কাটছিলেন। পা নামিয়ে প্রশ্ন করলেন: কি চাই?

চাকরি—

কি চাকরি?

যা দেবেন। ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আঁকাড়া! যা-ই দেবেন সোনামুখ করে নেবো। কাজ দেখিয়ে তার পরে উন্নতি।

কাজ দেখালে উন্নতি—ভদ্রলোক মুখ টিপে হাসলেন। মেজাজে ছিলেন, মানুষটি ভালও বটে। অবোধ কথাবার্তায় মজা লাগছে। বললেন, লোয়ার ডিভিসনের ক্লার্ক নেওয়া হবে জনা চারেক। দরখাস্ত করে দেখতে পারেন, ছাপা ফরম, এক টাকা করে দাম। কিনতে গিয়ে কিছু বাজেখরচ আছে, ধরে নিন আরও এক টাকা। নয়তো ফরম ফুরিয়ে গেছে, পিওন বলে দেবে। যাকগে আমিই আনিয়ে দিচ্ছি, বাড়তি টাকা লাগবে না।

স্লিপে কী-একটু লিখে টাকা-সহ পাঠিয়ে দিলেন, একটু পরে ফরম এসে পৌঁছল।

লোকটি বললেন, পূরণ করে অফিসে জমা দিয়ে দেবেন। রসিদ নিয়ে নেবেন। সে-ও নির্ঝঞ্ঝাটে হবে না বোধহয়। কাজ নেই, আমার হাতে দিয়ে যাবেন। সোমবারে শেষ তারিখ, তার মধ্যে।

কাজ ঝুলিয়ে রাখবে, তেমন উমেদারি অরুণেন্দুর নয়। এখনই—এই মুহূর্তে। বেলা তিনটে, ঘড়ি দেখে নিল। তড়িঘড়ি এখানকার দরখাস্ত সেরে আরও দু-জায়গায় ঢুঁ মারবে অফিস-ছুটির ভিতরে। পকেটবুকে তাই ছকে এনেছে।

ফরম পূরণ করে সামনে রেখে দিয়ে প্রশ্ন করে: এবারে?

জুতোর দোকানে গিয়ে জুতো কিনে ফেলুন একজোড়া। ভারী-সারি, মজবুত সোল।

অরুণ সবিস্ময়ে তাকিয়ে পড়ে।

ভদ্রলোক বলে যাচ্ছেন, সিলেকসন জানুয়ারিতে, ছুটো মাস মাত্র সময়। সঙ্কল্প করে নিন, দু-মাসের মধ্যে জুতো ক্ষয়ে ক্ষয়ে শুকতলা অবধি পৌছবে।

বলে হেসে উঠলেন তিনি : নাঃ, উমেদারি লাইনে আপনি নিতান্ত কাঁচা। কোম্পানির সাতজন ডিরেকটর। দু-মাসের নিতিদিন সাত বাড়িতে তদ্বির করে ঘুরতে ঘুরতে লোহার জুতোই তো ক্ষয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। চামড়ার জুতো কেন হবে না?

ফরমখানা অরুণেন্দু মেলে ধরল : এই দেখুন—

মোটা হরফের ঘন কালিতে ছাপা রয়েছে : ক্যানভাসিং কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ, উমেদার কেউ ক্যানভাসিং-এ গেলে দরখাস্ত নামঞ্জুর হবে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, আমরাই ছেপে দিয়েছি—আপনাদের উপকারার্থে। ক্যানভাসিং নামে গুরুতর এক বস্তু আছে, পাছে ভুলে বসে থাকেন। বিনি ক্যানভাসিং-এ শুধুমাত্র কোয়ালিফিকেসনের জোরে কারো চাকরি হয় না, একটা বাচ্চা ছেলে অবধি তা জানে।

কত কত আজব বিষয় নিয়ে ক্লাস খুলছে আজকাল—পরীক্ষা নেয়, ডিপ্লোমা দেয়। আমাদের শশী মুদ্রণকর্মের ডিপ্লোমা নিয়েছে, হাবুল সাংবাদিকতার। অধ্যাপক হয়ে ঐ ঐ ক্লাসের যাঁরা পাঠ দিয়ে থাকেন, নিজেরা কোথায় পাঠ নিয়েছিলেন জবাব দিতে পারবেন না। জন-হিতে হাল আমলে ঐ সব চালু হচ্ছে। চাকরি-বাকরি পাচ্ছে না—আশাবৃক্ষ পুঁতে জলসেচন করে যাক কোনো একদিন ফললাভ হবে এই আশায়। উমেদারি নিয়েও ক্লাস ও ডিপ্লোমার ব্যবস্থা থাকা উচিত। অতিশয় জটিল শাস্ত্র, হরেক তার নিয়ম-পদ্ধতি। বহুদর্শীরা ঠেকে শিখেছেন, আনাড়ির কাছে খেয়ালমাফিক

অল্পসল্প ভাঙেন। যেমন এই একটা। 'ক্যানভাসিং স্ট্রিক্টলি প্রোহিবিটেড'-এর যথার্থ মানে : ক্যানভাসিং বস্তুটা অতিশয় জরুরি, ভুলেছ কি মরেছ। ঠিক মতন মানে বোঝে না বলেই উমেদারের ঝামেলা বাড়ে।

এত হৈ-হুল্লোড়ের ছেলে, খানিক খানিক কী রকম গম্ভীর হয়ে পড়ে। ভাবে চুপচাপ। জয়ন্তর কষ্ট হয়। বলে, ঘাবড়াস নে, চেষ্টা করে যা, নিশ্চয় হবে।

অরুণ ক্ষেপে উঠল : মাতব্বরি করবি নে, বুড়োদাদার মতন মাথায় হাত বুলানো সহ্য হয় না। বচন ছাড়ুকগে সেই শালারা চাকরি-বাকরি মান-প্রতিপত্তি টাকা-পয়সা যারা কবজা করে বসে আছে।

এমন কথাবার্তা স্বভাবেই নয় বলে মুহূর্তে আবার সে পূর্ববৎ। জয়ন্তর সুরে সুর মিলিয়ে বলল, হবেই চাকরি—না হয়ে যাবে কোথায়? কায়দা রপ্ত হয়ে এসেছে—চেষ্টা কারে কয়, দেখিয়ে দেবো এবার। চাকরি পেয়ে এভাবে থাকা চলবে না—তাই তো, তাই তো—

হেসে বলে, সামনের ঐ দোতলা ফ্ল্যাটে উঠে যাব। ফ্ল্যাটের জিনিস সমস্ত তুই সরবরাহ করিস। আর দোতলা থেকে হাঁক ছাড়ব, চাঁদমোহন খাবার-দাবার পাঠিয়ে দেবে।

জয়ন্ত বলে, বেকার থেকে থেকে কবি হলি যে হতভাগা। স্বপ্ন দেখছিস।

অরুণেন্দু বলে, সিনেমা দেখতে পয়সা লাগে, স্বপ্ন নিখরচায় দেখা যায়। দিব্যদৃষ্টি খুলে যাচ্ছে আমার—জীবনটাই স্বপ্ন। সুবিধা বুঝে পালটাপালটি করে ফেলছি আমি। যা-কিছু ঘটছে বলে জানি—এই চলাফেরা, চাকরির উমেদারি, মানুষকে আমড়াগাছি করা—সমস্ত অলীক। স্বপ্নই সত্য।

জয়ন্ত বলে, কিচ্ছু আশা নেই তোর ভাই। নজরটা বড্ড ছোট। স্বপ্নেই খেলি তো চিঁড়ে-মুড়ি কেন খাবি হতভাগা—পোলাও-কালিয়ায় বাধাটা কি? বাসা করলি তো আমাদের এঁদোপাড়ার মধ্যে কেন, চৌরঙ্গির উৎকৃষ্ট ফ্লাট নিবি। লাঞ্চ খাবি তো চাঁদ-কেবিনে কেন, পাঁচতারা-ওয়ালা বড় হোটেলে টেলিফোনে ফরমাস করবি।

অরুণেন্দু চিন্তিত ভাবে বলে, ফোন পেয়ে পাঠাবে তারা চাঁদমোহনের মতো?

পাঠাবে তো বটেই। কিন্তু কখন পাঠাবে সেই ভরসায় আছিস নাকি তুই? ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ছুটবে।

অরুণেন্দু তর্ক করে: গাড়ি তো ছেলেপুলে নিয়ে ইস্কুলে বেরিয়ে গেছে।

আ আমার কপাল, গাড়ি একখানা কেন হবে! অসুবিধা যখন, দুটো-তিনটে কিনলেই তো হয়।

হুঁশ হল অরুণের এবার: বটেই তো! দাম যখন লাগছে না, তিনটে কেন পুরো এক ডজন কিনে রাখা যাক। সত্যি বলেছিস জয়ন্ত। মনে মনে সমস্ত হল, কিন্তু নজর কিছুতে বড় হচ্ছে না।

চাঁদমোহন-কেবিনে হঠাৎ একদিন পূর্ণেন্দুর আবির্ভাব। দিনমানের উমেদারি সেরে সন্ধ্যাবেলা অরুণ এক কাপ চা খেয়ে নেয় এখানে, তারপর খাতা লিখতে গিয়ে বসে। নিত্যিদিনের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিন এসে দেখল, বাইরের বেঞ্চিখানায় পূর্ণেন্দু তার অপেক্ষায় বসে রয়েছে।

ভূত দেখে লোকে আঁতকে ওঠে, অরুণেরও তাই।

দাদা?

রেলে আসার তো খরচা নেই, যখন-তখন আসতে পারি। এলে তুই বেজার হবি, সেই ভয়ে আসি নে।

ঠিকানা কি করে পেলে?

পূর্ণেন্দু মুখ টিপে হেসে বলল, আচায্যিঠাকুর খড়ি পেতে বলে দিলেন।

জয়ন্তর জেঠতুত-ভাই হলধর বিড়ি কিনতে গিয়েছিল, বিড়ি ধরিয়ে পূর্ণেন্দুর পাশে এসে বসল। ঠিকানা পাওয়ার রহস্য সেই মুহূর্তে পরিষ্কার। হলধর গ্রামে থাকে, কিছুদিন আগে কলকাতায় এসে জয়ন্তর সঙ্গে চা খেয়ে গিয়েছিল এখান থেকে। অরুণেন্দু সেই সময়টা ছিল। পূর্ণেন্দুকে হদিস দিয়ে হলধরই সঙ্গে করে এনেছে, সন্দেহমাত্র নেই।

অরুণ বলে, তাই তো বলি! আচায্যিঠাকুর খড়ি পাতলে উল্টো ঠিকানা বেরিয়ে আসত। পাঁচঘরার আত্মারাম আচায্যি আর আলিপুরের আবহাওয়া-অফিস যা বলবেন, হবে ঠিক তার উল্টোটি।

আত্মারাম আচার্য যশোদার গুরুঠাকুর, তাঁরই কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন। গুরুঠাকুরের নিন্দেয় পূর্ণ চটে যায়ঃ কোনটা তিনি উল্টো বলেছেন শুনি?

বলেছিলেন, সম্রাট শাহানশা হবো আমি, টাকার আণ্ডিলের উপর বসে থাকব।

হবি তাই। সময় কি বয়ে গেল?

সগর্বে পূর্ণেন্দু বলতে লাগল, অঢেল লেখাপড়া শিখবি—তা-ও বলেছিলেন। পাঠশালার আটআনা মাইনেই জুটত না—মা বিশ্বাস করেন নি তখন। ঠাকুরমশায় বলেছিলেন, দেখো তোমরা—মিলিয়ে নিও। তা সর্বজনে দেখুক আজ মিলিয়ে মিলিয়ে। বি-এ পাশের গ্রাজুয়েট শুধু নয়, ভাই আমার এম-এ।

তা-ও কানে গেছে তোমার?

কটমট করে অরুণ হলধরের দিকে তাকায়ঃ সমস্ত গিয়ে লাগিয়েছেন—কিছুই বাদ দেন নি? চায়ের সঙ্গে জয়ন্ত সেদিন পকৌড়ি-ভাজা এনে খাইয়েছিল। তা-ও বোধহয় বলেছেন?

পূর্ণেন্দু বলে, এম-এ পাশ আর পকৌড়ি-ভাজা এক জিনিষ হল?

এক কেন হবে দাদা। পকৌড়ি খেয়ে সস্তায় পেট ভরানো যায়। আর এম-এ পাশের যে কাগজখানা দেবে, পুড়িয়ে চায়ের জল গরম হতে পারে বড়জোর—আর কোন কাজে আসে না।

য়ুনির্ভাসিটি-হলে কনভোকেশন। কী জাঁকজমক—ইন্দ্রপুরী করে সাজিয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত এসেছেন বক্তৃতা করার জন্য, গভর্নর এসেছেন। দেশের মাথা মাথা যাঁরা, কারো আসতে বড় বাকি নেই। লাইন করে দিয়েছে, ছেলেমেয়েরা একে একে এসে উপাধি-পত্র নিয়ে যাবে।

হঠাৎ বজ্রপাত সভার মধ্যে।

চিরশান্ত ছেলেটা ফুঁসে ওঠে—প্লাটফরমে উঠে পড়ে মাইক টেনে নিজের কাছে নিয়ে আসে: ডিগ্রি চাই নে, চাকরি চাই—খেয়েপরে বাঁচতে চাই।

শত শত কণ্ঠের প্রতিধ্বনি: চাকরি চাই, চাকরি চাই—। তারপর উপাধিপত্র ছিঁড়ে হুড-গাউন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছেলেটা ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। সভা লণ্ডভণ্ড—বিশ্বপণ্ডিতের বক্তৃতা জমল না। চাকরি দাও, চাকরি দাও—ধ্বনিতে য়ুনিভার্সিটির হল-বারান্দা ভেঙে চৌচির হয়ে যায় বুঝি। গভর্নর ঘাড় নিচু করে গাড়ির মধ্যে ঢুকে দরজা এঁটে দিলেন।

ছবিটা চকিতে অরুণেন্দুর মনের উপর দিয়ে যায়। সেদিন চোখে দেখে এসেছিল, হাড়ে মাসে বুঝে নিয়েছে এখন। যেন ভারি একটা লজ্জার কাজ করে বসেছে—মুখে বেকুবির হাসি নিয়ে হাত কচলে অরুণ ভাইয়ের কাছে কৈফিয়ত দিচ্ছে: নেই কাজ তো খই ভাজ—হঠাৎ হয়ে গেল দাদা। রাত এগারোটা বারোটা অবধি চাঁদমোহনরা এইখানে বসে আড্ডা জমায়—অত আমি পেরে উঠি

নে। একলা ঘরে কী করি—এর ওর বই চেয়েচিন্তে চোখ বুলাতাম। টের পেয়ে জয়ন্তটা ঘাড়ে লাগল, নিজের থেকে ফী জমা দিয়ে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষায় বসিয়ে তবে ছাড়ল। দশচক্রে ভগবান ভূত বানাল।

চাঁদমোহন খদ্দেরকে চা দিচ্ছিল, এগিয়ে এসে কথার মাঝে ফোঁড়ন কাটেঃ বিশ্বাস করবেন না দাদা, পড়েছে মোটমাট পনের কি বিশটা দিন। বাজি ধরেছিলাম, যদি তুই পাশ করিস এইসা একজোড়া কবিরাজি-কাটলেট নিজ হাতে বানিয়ে খাওয়াব। হতভাগাটা তাই খেয়ে তবে ছাড়ল।

অরুণ সদম্ভে বলে, ধর্ বাজি আবার। ফী-টি গুলো তোরাই দিবি। ফের একদফা এম-এ পাশ করে দেখাই। এম-এ বলে কথা কি—যেটা বলবি, তাতেই পাশ করব।

দুই কাটলেট হেরে বাজিতে চাঁদমোহনের আর অভিরুচি নেই। বলে, রক্ষে কর, পরীক্ষায় পাশ-করা ডাল-ভাত তোর কাছে—এক বারেই ভাল মতো বুঝে নিয়েছি। আর আমার এক ছোটকাকা ছিল—সাত সাতবার সে ফাইন্যালে বসেছে। বিয়ে হল, ছেলে হল—সেই ছেলে যখন ইস্কুলে ঢুকল, লজ্জায় তখনই ইস্তফা দিয়ে দিল। কী পড়াটাই না পড়ত ছোটকাকা! রাত দুপুরে উঠে সকাল অবধি একটানা গলা ফাটিয়ে চেঁচাত—ঘুমের মধ্যে সর্বক্ষণ শুনতাম। এই থেকে পরীক্ষায় আতঙ্ক জন্মে গেল, ওপথে বেশি আর এগোলাম না।

বাজে গৌরচন্দ্রিকার পরে পূর্ণেন্দু এইবার আসল কথায় এলো, যার জন্য ভায়ের খোঁজে খোঁজে এদ্দূর—এই চাঁদমোহন-কেবিন অবধি ধাওয়া করেছে। অরুণের হাত ধরে টান দিলঃ চল আমার সঙ্গে, কিছু কেনাকাটা করব।

ঘাড় নেড়ে অরুণ বলে, এখন হবে না তো দাদা, কাজ আছে।

জানি, খাতা-লেখার চাকরি। ইচ্ছে মতন কামাই করতে পারবি

নে—তবে আবার চাকরি কিসের? সে তো দিনমজুরি।

যা-চ্ছলে, সবই তুমি জানো দাদা! ঐ একবার দেখায় হলধর-দা অন্ধিসন্ধি সমস্ত জেনে গিয়েছেন?

পূর্ণেন্দু বলে, জ্বর হয়েছে তোর, যেতে পারলি নে—জয়ন্ত বলে দেবে। চল—

দু-ভাই কাপড়ের দোকানে ঢুকল: একটা থান-ধুতি আর শাড়ি একখানা। খেলো জিনিস না হয়, আবার মেলা দামের হলেও চলবে না।

কাপড় কেনার পর পোশাকের দোকানে: দু-মাসের বাচ্চার উপযোগী একটুকু জামা আর জাঙিয়া।

অরুণেন্দু বলে, কাপড় তো বুঝলাম মার আর বউদির। জামা কার জন্যে?

তোর বউদির মেয়ে হয়েছে যে!

অরুণেন্দু আহত কণ্ঠে বলে, এত বড় একটা খবর—আমি কিছু জানি নে!

ভাইয়ের মুখের দিকে পূর্ণেন্দু তাকিয়ে পড়ল: ও, বড় খবর এইটে! বিয়ে করলে ছেলেমেয়ে হয়—সব ঘরেই হয়ে থাকে। কিন্তু এম-এ পাশ ক'জনের ঘরে শুনি। সে খবর দিয়েছিলি তুই?

দোকান থেকে রাস্তায় নেমেছে, তখনো পূর্ণেন্দু গজরাচ্ছে: দুটো বছর কাটতে চলল, একবার তুই বাড়িমুখো হোস নি। একটা পোস্টকার্ড লিখেও খবর নেবার পিত্যেশ নেই। ভাগ্যিস হলধরের সঙ্গে দেখা, কথায় কথায় তোর কথা উঠল, কলকাতার অকূল সমুদ্দুরে তাই খুঁজে বের করলাম। আবার এখন মুখ নেড়ে ঝগড়া করছে দেখ।

কমলালেবু কিনল সে এক টাকার। বড় দুটো ফুলকপি কিনল। মিষ্টির দোকানে ঢুকে সন্দেশ কিনল।

চোখ বড় বড় করে অরুণ বলে, ও দাদা হল কি তোমার—দু-হাতে খরচ করতে লেগেছ, এমন তো কখনো দেখি নি।

পূর্ণ বলে, এখন তো নিজেরা শুধু নই—পরের মেয়ে, তোর

বউদি সংসারে এসেছে। সে এসে পোঁটলাপুঁটলি হাতড়াবে, মার বিছানার কাছে নিয়ে গিয়ে জিনিস দেখাবে। চাকরে-ভাই এদ্দিন বাদে বাড়ি যাচ্ছিস—খালি-হাতে উঠবি কেমন করে?

স্তম্ভিত হয়ে অরুণ বলে, বাড়ি যাচ্ছি আমি?

হ্যাঁ—

আমি চাকরে-ভাই?

পূর্ণ বলে, চাকরি করিস—সে কি মিথ্যে?

ঠিক ঠিক, দু-ঘণ্টা খাতা লিখি—সেটা চাকরিই বটে। হলধর-দা চাকরির খবর তো দিয়েছে, মাইনের খবর দেয় নি? তা-ও তো জয়ন্তর কাছে শুনে নিতে পারত।

পূর্ণ বলে, মাইনের খবরে কি হবে, কেনাকাটা তোর পয়সায় তো করতে বলি নি।

থমকে দাঁড়িয়ে দৃঢ়কণ্ঠে অরুণেন্দু বলল, বাড়ি আমি যাবো না।

কেন, কি হল?

নতুন কিছু নয়, যে কারণে এই দুটো বছর বাড়ি যেতে পারি নি। ভাই-ভাজ-ভাইঝি-মা সকলের জন্য সাধ মিটিয়ে যেদিন কেনাকাটা করতে পারব, বাড়ি যাবো সেই সময়। চাকরে হীরালাল-জেঠা যেমন বাড়ি যেতেন।

সেকেলে কাহিনীটা চকিতে মন ছুঁয়ে গেল। হীরালাল-জেঠা পুজোর সময় বাড়ি আসতেন। কোন মার্চেন্ট-অফিসের বড়বাবু তিনি। ছয় ক্রোশ দূরে রেল-স্টেশন, স্টেশন থেকে ঘোড়ার-গাড়ি ভাড়া করে আসেন। গাড়ির আষ্টেপিষ্টে জিনিস বোঝাই—জিনিস-পত্রের আণ্ডিলের মধ্যে হীরালাল গোলাকার এতটুকু হয়ে বসতেন, চোখেই পড়েন না তিনি, বিস্তর ঠাহর করে তবে দেখতে হয়।

বাইরে-বাড়ির উঠানে গাড়ি এসে থামল, খোপ থেকে বেরিয়ে হীরালাল খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন। তালবৃক্ষের মতন দীর্ঘ দশাসই

পুরুষ। জিনিসপত্র চতুর্দিকে নামিয়ে স্তূপাকার করেছে। গাঁয়ের মানুষ আসতে কারো বাকি নেই। কী বৃত্তান্ত, না, চাকরে হীরালাল বাড়ি এলেন। ঘোড়ার-গাড়ির ছাত থেকে কাপড়ের বড় গাঁটটা নামাল। বাড়ির সবাই তো বটেই—এবাড়ি-ওবাড়ির বুড়ো-বুড়িরা, গুরু-পুরুত কামার-কুমোর ধোবা-পরামাণিক চাকর-মাহিন্দার কাপড়ে কেউ বঞ্চিত হবে না। দিন দশেক হীরালাল-জেঠা বাড়ি থাকবেন—বাড়িতে অহরহ মচ্ছব। চাকরে-মানুষটি বাড়ি এসেছেন, পরিচয় দিয়ে বলতে হবে না—উঠানে পা ফেলেই মালুম পাওয়া যাবে। অরুণেন্দু খুব ছোট তখন, নিজের তেমন-কিছু মনে নেই—যশোদার মুখে গল্প শুনত হীরালাল-জেঠার বাড়ি আসার কথা। ছবি হয়ে মনে তাই গাঁথা রয়েছে।

অরুণেন্দু বেঁকে বসল: না দাদা, আমি যাবো না। টানাটানি করো যদি, এমনি ডুব দেবো নিশানাই পাবে না আমার। কলকাতা ছেড়ে দূর-দূরান্তর পালাব।

উত্তেজিত হয়েছে খুব। কাছেই পার্ক, দু-ভাই একটা বেঞ্চি নিয়ে বসল। অরুণ বলে, পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে পড়ে মা আমার পথ তাকাচ্ছেন, নতুন-মা হয়ে বউদিরও ইচ্ছে আপনজনেরা এসে পড়ে আমোদআহ্লাদ করুক। সমস্ত জানি দাদা, সাধ-আহ্লাদ আমার মনেও আসে। একছুটে বাড়ি গিয়ে উঠি, কত সময় ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু পড়ার সময়টা সবাই তোমরা কী চোখে দেখতে আমায়, কতরকম প্রত্যাশা করেছিলে—কোন লজ্জায় এখন আমি থোঁতামুখ ভোঁতা করে দাঁড়াব।

একটা লেবু খোসা ছাড়িয়ে পূর্ণ ভাইকে খাওয়াচ্ছে—দুটো একটা কোয়া নিজেও গালে ফেলছে, নয় তো অরুণ খাবে না। সন্দেশ বের করে ভাইয়ের হাতে দিল, সে আবার এতটুকু ভেঙে পূর্ণেন্দুর মুখে পুরে দিল। অনেককাল আগে দু-ভাই মিলেমিশে এমনি করে খেতো।

পূর্ণেন্দু বোঝাচ্ছে: মাকে সামলানো যাচ্ছে না রে ভাই।

তাঁর বিদ্বান ছেলে কাজকর্ম না পেয়ে বেকার হয়ে ঘুরছে, তামা-তুলসি ছুঁয়ে বললেও মা মেনে নেবেন না। ওঁদের সেই সেকালের বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে আছেন: শহরে গেলেই চাকরি, আর যেমন-তেমন চাকরি দুধ-ভাত। বিশ্বাস কিছুতেই টলানো যাবে না। কাজকর্ম মেলামেশার মধ্যে থাকলে খানিকটা হয়তো ভুলে থাকতে পারতেন—শুয়ে শুয়ে কেবল তোরই চিন্তা সর্বক্ষণ। কুপুত্র তুই, দিনকে-দিন মাথায় ঢুকছে—আমাদের সকলকে ছেড়ে শহরের উপর সুখে-স্বচ্ছন্দে আছিস নাকি তুই। শরীরের যা দশা, যখন তখন মারা যেতে পারেন। বুকে দাগা নিয়ে যাবেন মা আমাদের।

হাত জড়িয়ে ধরল সে অরুণেন্দুর: একটিবার না গেলে হবে না তো ভাই। হঠাৎ একদিন ঘরে ঢুকে দেখি, মা চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন—দু-চোখে দরদর করে জল গড়াচ্ছে। তখন জেদ চেপে গেল, আনবোই তোকে বাড়িতে। খোঁজ করে করে কত কষ্টে এসে ধরেছি।

ঝিম হয়ে থাকল অরুণেন্দু। তারপর হেসে ওঠে: সকলের কাপড়-জামা, কেবল আমার দাদার জন্যে কিছু নয়। যে দাদা হাত চেপে ধরে একদিন প্রেসিডেন্সিতে পড়বার জন্য কলকাতা পাঠিয়েছিল, আজকে আবার হাত চেপে ধরে বাড়ি নিয়ে চলল। অরুণের নিন্দেয় পাড়াময় ছি-ছি পড়বে, দাদা হয়ে সেটা তুমি কেমন করে হতে দেবে!

দ্রুত সে আবার কাপড়ের দোকানে ঢুকে একটা ধুতি কিনল। জরি-পাড় শান্তিপুরে শৌখিন ধুতি। পূর্ণেন্দু মনিব্যাগ বের করতে যাচ্ছিল, অরুণ তাড়া দিয়ে উঠল: খবরদার! সব কথায় তুমি হাত জড়িয়ে ধরো, এবারে কিছুতে শুনব না।

ব্যাগ পকেটে ফেলে পূর্ণেন্দু হেসে বলে, জরি-পাড় ধুতি পরি আমি কখনো?

ধুতিই পরো না, যা-হোক একটু নেংটি মতন পরে বেড়াও। কিন্তু চাকরে-ভাই দিচ্ছে, ফেলে তো দিতে পারবে না। কপালে আছে—কষ্টেসৃষ্টে পরো জরি-পাড় ধুতি, কী করবে!

॥ ছয় ॥

স্টেশনে এসে টিকিট কিনছে। অরুণেন্দু বলে, একটা কেন দাদা ?

পূর্ণেন্দু বলে, রেলগাড়ি আমাদেরই—আমি কেন টিকিট করব ? প্লাটফরম-টিকিট একটা না-হয় কেনা যাক।

তা-ও কিনল না, কিনতে গিয়ে ফিরে এলো। বলে, কেন লাগবে —চোখ টিপে দিলেই হয়ে যাবে, মনে হয়। কলকাতায় আসা-যাওয়া নেই, সঠিক জানিনে। তা হলেও এক রেলগাড়ি, একই লাইন—আমাদের ওদিকে হয় তো এখানেই বা না হবে কেন ? দেখি—

রেলগাড়ি আমাদের—বলে পূর্ণেন্দু সরকারি রেলগাড়ির উপরে স্বত্ব-স্বামিত্ব ঘোষণা করল। একটি বর্ণ মিথ্যা নয়, ক'টা স্টেশন পার হতেই মালুম পাওয়া যাচ্ছে। দিব্যি একটা দল ওদের—চোখ-টেপাটিপি, ঠারেঠোরে কথাবার্তা, মাঝেমধ্যে দাদা চাচা মামা ইত্যাকার ডাকাডাকিও আছে। অদ্ভুত তুখোড় মানুষগুলো—মানুষের চেয়ে বরঞ্চ কাঠবিড়ালি-টিকটিকি-নেংটিইঁদুরের সঙ্গে মিলটা বেশি। ঘরব্যাভারি আমাদের পূর্ণেন্দু আর রেলের-ক্ষড়ে এখনকার এই পুন্ন—দুটো মানুষ একেবারে আলাদা। রেলগাড়িতে উঠে লহমার মধ্যে কেমন বদলে যায়। কামরার ভিতরে বেঞ্চির উপর বসে চলাচল নয়—দৈবেসৈবে ঢুকে গেল তো দাঁড়িয়ে থাকবে। ভদ্র হয়ে বসা অনভ্যাসে, খুব সম্ভব, ভুলে গেছে। মানুষ নয়, একদল কাঠবিড়ালি পিলপিল করে চলতি গাড়ির গা গড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

চলে গেল উই ইঞ্জিন অবধি, ফিরে এলো। পাদানি নেই, দুটো পা-ই শূন্যমার্গে—জানলার রডে ঝুল খেয়ে পড়ে চলাচল। কখনো বা ফুড়ুত করে অদৃশ্য হল তলদেশে—চাকার অন্ধিসন্ধিতে নেংটি-ইঁদুরের মতন বেড়াচ্ছে। ছাতের উপরেই বা উঠে পড়ল, তিড়িং-মিড়িং করে এ-ছাতে ও-ছাতে লম্ফ দিয়ে বেড়ায়। পাশপোর্ট রে হেনো রে তেনো রে, কত না বিধিনিষেধ—কাস্টমসের কত না কড়াকড়ি! ঘোড়ার-ডিম—দেখে আসুন ফলাও কাজকারবার চলছে কেমন। গাড়ির আগাপাস্তলা জুড়ে গুপ্তভাণ্ডার। যে দেয়ালটা ঠেশ দিয়ে আছেন, কে জানে, ঢিলে ইস্ক্রুপটা তুলে কাঠখানা সরিয়ে দিলে হয়তো লবঙ্গর থলে বেরিয়ে পড়বে। অথবা এক ডজন রিস্টওয়াচ। চারিদিক কাঁপিয়ে রেলগাড়ি ঘোরবেগে ছুটেছে, সড়াক সড়াক করে পুলগুলো পার হয়ে যাচ্ছে—এরই মধ্যে নিশিরাত্রে এমনও হয়ে থাকে, চলন্ত চাকার মাঝে রডের উপর হাত-পা ছড়িয়ে টান-টান হয়ে কেউ শুয়ে পড়ল। দুই পাটির মধ্যে নুড়ি ঢালা—হাতখানা সামান্য নেমে গেলেই নুড়িতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। রডের আরামের শয্যায় একচুল এদিক-ওদিক হলে পড়ে গিয়ে খানিকটা মাংসপিণ্ড ছাড়া কিছু আর অবশিষ্ট নেই। অতশত কে এখন ভাবে—অবাধ্য চোখ দুটো ঘুমের ভারে ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ হয়ে যায়। রেলের বাবুরা দেখেও এ সমস্ত দেখেন না। আঙুল দেখিয়ে দিলেও উদার হাসি হাসেন: যেতে দিন না মশায়। আপনার ঘরের মধ্যেও তো ইঁদুর-আরশুলায় উৎপাত করে বেড়ায়, কী করে থাকেন? উদ্বাস্তুর বেদনায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যের হাসি—কলিযুগের পাপমতিরা অবশ্য বিশ্বাস করতে চায় না।

পূর্ণেন্দু এদেরই একজন। যশোদারই মতো বেঁটেখাটো ছেলেটি, দৌড়ঝাঁপের তাই সুবিধা হয়েছে। বাড়ির লোকে কাজকারবারের তবু তো পুরো চেহারাটা জানে না। ঘরের ভিতর হোগলার বেড়ার গায়ে বড়-ছোট দেবদেবীদের ছবি—লক্ষ্মী কালী গণেশ শিবদুর্গা হনুমান সরস্বতী ঘণ্টাকর্ণ রামলক্ষ্মণ—মেলার বাজারে ও পাঁজির

পাতায় যা-সমস্ত পাওয়া যায়। কাজে বেরুচ্ছে পূর্ণ, মলিনা তখন চতুর্দিকের পটে পটে মাথা ঠেকিয়ে ঘুরছে। আর ও-ঘরে শুয়ে শুয়ে যশোদা বিড়বিড় করছেন: আমার পুন্নকে সুভালাভালি ফিরিয়ে এনে দিও ঠাকুর-ঠাকরুনেরা।

প্রতিদিনের এই নিয়ম—যে দিনটা যায়, সেই দিন ভালো।

●

ও পুন্নর মা, অরু কী নিয়ে এলো দেখতে এলাম—

আত্মারাম আচার্যের বউ নিস্তারিণীর গলা। অরুণেন্দু আজ বেলা করে উঠে আশশ্যাওড়ার ডাল ভেঙে দাঁতন করতে করতে ডোবার ঘাটে যাচ্ছিল, ঘর-কানাচে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চাকরে-ছেলে আনল কি তোমাদের জন্যে?

যশোদা বললেন, বাচ্চা-খুকুর জন্যে জামা এনেছে। কাপড় সকলকার জন্যে। সন্দেশ আর কমলালেবু এনেছে। কপি আমি ভাল খাই, তা-ও দেখি দুটো হাতে করে এসেছে। বওয়াবয়ি করে বেশি কী আনতে যাবে। বায়না ধরেছে, কলকাতায় চলো, কলকাতার বড় বড় ডাক্তার দিয়ে ভাল মতন চিকিচ্ছে-পত্তোর করাব।

[জপতপের উপর আছেন মা-জননী, শুয়ে শুয়েও ছাড়েন না—তারই মধ্যে মিথ্যে বানাচ্ছেন কেমন দেখ! বাঘা নভেলিস্টও হেরে ভূত হয়ে যাবে।]

নিস্তারিণী বলেন, এক্ষুনি চলে যাও দিদি—এক্ষুনি, এক্ষুনি। আজ হয় তো কালকের জন্য দেরি কোরো না। আজকের মানুষ নই আমি—ঘরবাড়ি জমিজিরেত বাগান-পুকুর নিয়ে তোমাদের কত বড় গৃহস্থালী! নারকেল পেড়ে পেড়ে মাহিন্দারে এক-মানুষ সমান গাদা করে রাখত, কাঁদি কাঁদি টুকটুকে সুপারি উঠান জুড়ে ছড়িয়ে রাখত রোদে শুকানোর জন্য। এই দুটো চোখে সমস্ত দেখেছি। আবার পোড়ো জায়গায় নড়বড়ে দুটো তালপাতার ঘর—তা-ও

এখন দেখতে পাচ্ছি।

জোর দিয়ে আবার বললেন, চলে যাও দিদি, শহরের উপর রাজার হালে থাকবে। নিত্যিদিন গঙ্গাস্তান করবে, মা-কালীর দর্শন পাবে—এমন ভাগ্যি ক'টা মানুষের হয়! ছেলে বলি তোমার পুন্নকে—কী কষ্ট করে ভাইকে মানুষ করল। কষ্ট করেছিল তাই সুখশান্তি এবারে—পায়ের উপর পা চাপিয়ে বসে থাকা। আর আমি ছুটো অকালকুষ্মাণ্ড গর্ভে ধরেছি—পণ্ডিত-বাড়ির ছেলে হয়ে বিড়ি বাঁধে, হাটে হাটে বিড়ি বিক্রি করে বেড়ায়।

[বিড়ি বাঁধার কলেজ হয়েছে কোথাও? ডিপ্লোমা দেয়?]

যশোদা অরুণেন্দুর আরও খবর দিচ্ছেন: বি-এ পাশ ছিল তো—সেই বি-এ'রও উপরে, এম-এ পাশ করে ফেলেছে এবার। বিদ্যের আর মুড়োদাঁড়া রইল না।

নিস্তারিণীর প্রশ্ন: অরুর মাইনে কত দিদি? মেলা টাকা নিশ্চয়—শহরের উপর বাসা করে থাকা চাট্টিখানি কথা নয়।

অরুণেন্দু দ্রুত ডোবার ঘাটে নেমে খলবল করে মুখ ধুতে লেগেছে। দু-কানে আর শোনা যায় না।

ফিরে আসতেই মলিনা রেকাবিতে লুচি কপির-তরকারি আর বাটিতে মোহনভোগ নিয়ে এলো। বলে, খেতে লাগুন ঠাকুরপো, চা করে আনি। করে রাখিনি জুড়িয়ে যাবে বলে।

অরুণ রাগ করে বলে, চা খাবো না আমি। কোন-কিছুই খাবো না। দাঁড়ান।

থতমত খেয়ে মলিনা দাঁড়িয়ে পড়ল।

কী লাগিয়েছেন বলুন দিকি। এমন করলে এখনই পালিয়ে যাবো।

মলিনা ভয় পেয়ে বলে, কী করলাম?

লুচি, মোহনভোগ—রাজসূয় আয়োজন। কুটুম্ব এসেছি যেন বাড়িতে।

কুটুম্ব কেন হবেন, রাজা—

কী না কী ঘটেছে—বউটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভয় গিয়ে এবারে ফিক ফিক করে হাসছে। বলে, খুকুর জন্মপত্রিকা হবে বলে মা আচাযি ঠাকুরমশায়কে খবর দিয়ে এনেছিলেন। সেই একটু সময় এসেও আপনার কথা। বিদ্বান হবেন, রাজা হবেন—আপনার ছোটবেলা হাত দেখে তিনি বলেছিলেন। অক্ষরে অক্ষরে সব ফলে যাচ্ছে। এম-এ পাশও তো করে ফেলেছেন এর মধ্যে, আমাদের কিছু জানান নি। বিদ্যের একেবারে চুড়োয় চলে গেছেন।

শুধু চূড়ো কেন বউদি ডালপালাগুলোও বাদ দিচ্ছি নে—

অরুণও হাসতে লাগল। বলে, দাদা চেপেচুপে কম করে আপনাদের বলেছে। যেটা চোখের সামনে পড়ে, পাশ করে যাচ্ছি। কাজকর্মে কখন কোনটা লাগে—পাশ করা রইল, দরকারের সঙ্গে সঙ্গে ডিপ্লোমা মেলে ধরব।

ঘাড় বাঁকিয়ে মলিনা বলল, দেখুন তা হলে। ভাইয়ের জাঁক মিছামিছি করেন না।

অরুণেন্দু বলে, বিদ্বান তো হয়েছি—আর রাজা হওয়ার কদ্দুর কি হল, তার কিছু বলেনি দাদা?

সোৎসাহে মলিনা বলে, বলেন নি আবার! চাকরি পেয়ে গেছেন।

আর?

বাসা হয়েছে—

অরুণ জুড়ে দিল: পাকা কোঠা—হেঁ হেঁ, খোলার চালা নয়।

তা-ও বলেছেন। কিচ্ছু বাকি রাখেন নি। ভাইয়ের কথা বলতে বুক ওঁর ফুলে ওঠে। হাঁকডাক করে পাড়া জানান দিয়ে বলেন।

বুঝেছি। সাত সকালে আচার্যিঠাকরুন মাঠ ভেঙে তাই মায়ের কাছে এসে বসেছেন। ঠাকুরমশায়ের গণনা কদ্দুর খাটল, স্বচক্ষে দেখে মাপজোপ নিয়ে যাবেন।

মলিনা খপ করে বলল, অর্ধোদয়ের যোগ আসছে—মাকে সেই সময় গঙ্গাস্নানে নিয়ে যাবেন। মার বড্ড ইচ্ছে।

অরুণেন্দু দরাজ। স্বপ্নেই যখন খাচ্ছি, চি ড়ে-মুড়ি খেতে যাবো কেন—কোপ্তা-কাবাব পোলাও-রাবড়ি খাবো। বলল, শুধু মা কেন, আপনারাও যাবেন—আপনি, খুকু, দাদা। নিজে এসে সবসুদ্ধ নিয়ে যাবো।

দরিদ্র-ঘরের কুরূপ গন্নাকাটা মেয়েটা কী করবে ভেবে পায় না। বলে, আমি কলকাতা দেখিনি ঠাকুরপো।

সেই কলকাতায় থাকতে হবে এবার থেকে। যোগের চান সেরে ফিরে আসা নয় আবার এখানে। নিত্যিদিন থাকবেন। দু-ভাই আমরা, মা, আপনি আর খুকু—

আহ্লাদে আপনহারা হয়ে মলিনা বলে, আরও একজন।

প্রথমটা অরুণ ধরতে পারে নি, জিজ্ঞাসার চোখে তাকাল।

মলিনা বলে, আজকেই বোধহয় মেয়েওয়ালারা কনে দেখার কথা বলতে আসবে। আপনি বাড়ি এসেছেন, সে খবর উনি জানিয়ে দিয়ে গেছেন।

উনি অর্থাৎ পূর্ণেন্দু। বাড়ি নেই সে, থাকলে একচোট হয়ে যেত। রাত দুটোয় উঠে পূর্ণেন্দু কাজে বেরিয়ে গেছে। কখন ফিরবে বাড়ির লোকে জানে না, সে নিজেও না। আদৌ ফিরবে কিনা, এমনিতরো শঙ্কা অহোরাত্রি আছে। তাইকে না পেয়ে অরুণেন্দু আপন মনে গজ-গজ করছে। বাড়ির নাম করে দাবানলের ভিতর ছুঁড়ে দিয়ে দাদা কাজে বেরিয়ে গেছে।

পাড়ার মানুষ একটি দুটি করে দেখা দিতে লাগল। বৃত্তান্তগুলো দেখা যাচ্ছে, ঘরেই শুধু নয়, পাড়া জুড়ে দস্তুরমতো ছড়ানো। অকস্মাৎ যেন এক বারোয়ারি বস্তু হয়ে পড়েছে সে, যার যেমন খুশি বিশেষণ ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। অভিধানের মতে প্রশংসা, কিন্তু

গলানো সিসের মতন কানের ছিদ্র পুড়িয়ে সেগুলো ঢোকে। নিরুপায় হয়ে অরুণ কাতর স্বরে 'আজ্ঞে না' 'কী যে বলেন' ইত্যাকার বিনয় প্রকাশ করে যাচ্ছে।

বেলা বাড়ছে, অবস্থা আরও সঙ্গিন হল। মুখের কথার উপর দিয়ে চলছিল, এর পর মালামাল হাজির হতে লাগল। বীচেকলা নিয়ে এলো একজন। বলে, তোমাদের শহরে চপ মেলে, কাটলেট মেলে, বীচেকলা মিলবে না। ভাতে দিতে বলে যাচ্ছি, খেয়ে দেখো।

এক গিন্নি ছুধের ঘটি সহ রান্নাঘরের সামনে এসে মলিনাকে ডাকলেন: ও বউমা, ছুধটুকু পাত্তরে ঢেলে নিয়ে আমার ঘটি অবসর করে দাও। এই মাত্তোর ছুয়ে আনলাম, বাঁটের গরম কাটেনি। শহরে ওরা তো ছুধের নামে খড়ি-গোলা জল খায়। এ জিনিষ পাবে কোথায়?

তারিণী মণ্ডল এক ভাঁড় খেজুর-রস এনেছে। বলে, চাকরে-ছেলে বাড়ি এসেছ, পুন্ন গিয়ে কাল বলল। ক'টা বাছাই গাছ আছে আমার—দা কোমরে নিয়ে তক্ষুনি উঠে গেলাম। শহরে এসব জোটে না। খেয়ে দেখ, কী রকম মিষ্টি। রস কি গুড় তফাত ধরতে পারবে না।

চোঁচা দৌড় দিলে কেমন হয়, অরুণ এক একবার ভাবছে। জুত হবে না—রে-রে করে পাড়াসুদ্ধ পিছু ছুটবে, ধরে পাছড়ে ফেলে কানের কাছে সারা বেলাস্ত গুণকীর্তন চালাবে। এমনি সময় যশোদা ঘরের ভিতর থেকে ডাক দিলেন: আমার কাছে আয় একটু বাবা। ঠাকুর আমায় কী দশায় ফেললেন—উঠতে গিয়েছিলাম, মাজার মধ্যে কড়াৎ করে উঠল।

উঠতে হবে না মা, আমি যাচ্ছি—

মায়ের ডাক আশীর্বাদের মতন। মানুষজনের রকমারি বচনে পাগল হবার জো হয়েছিল, ঘরে নিয়ে মা বাঁচিয়ে দিলেন। সম্পূর্ণ রেহাই নেই অবশ্য, এতগুলো মুখের জায়গায় শুধু এক মায়ের মুখে

শুনতে হবে এবার। তা হলেও বিস্তর বাঁচোয়া।

হাত বাড়িয়ে যশোদা শিয়রের দিক থেকে একটা কমলালেবু এনে অরুণকে দিলেন।

অরুণ বলে, লেবু তো ক'টা মাত্তোর—তোমার জন্যে এসেছে মা।

তা-হোক, তা-হোক—তোরা খেলেই আমার খাওয়া।

আবার দেয়ালের তাকে হাত দেবার জন্য প্রাণপণ করছেন। অরুণ বলল, কী মা?

নিস্তারঠাকরুন পাটালি দিয়ে গেলেন। ভিড়ে-পাটালি তুই কত ভালবাসতিস। পেড়ে নিয়ে খা।

অরুণেন্দু বলে, বউদি খানিক আগে একগাদা লুচি-মোহনভোগ খাওয়াল। পেটে আর জায়গা কোথা?

বউমা খাইয়েছে, আমারও তো বাবা ইচ্ছে করে।

আবার দাদা ফিরে এলে তারও ইচ্ছে করতে পারে।

যশোদা বলেন, করবেই তো। বাড়িঘরে থাকিস নে—ইচ্ছে সকলেরই করে। যে যা দেয় সোনামুখ করে খেতে হয়, 'না' বলতে নেই।

অরুণেন্দু আবদার ধরে: তুমিও খাবে কিন্তু মা। আহ্নিক-টাহ্নিক বাকি থাকে তো যা-হোক করে সেরে নাও। তুমি না খেলে আমি খাবো না।

যশোদার চোখে অকারণে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে এলো। ছোট্ট মেয়ে খুকুরই মতন আর একটি শিশু যেন। লেবুর কোয়া ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে অরুণ মায়ের গালে তুলে দিচ্ছে। আলগোছে নিজের গালেও ছুঁড়ে দিচ্ছে, হাত ঠেকায় না। পাটালিরও এক টুকরো মায়ের মুখে গুঁজে দিল।

এরই মধ্যে যশোদা একবার বললেন, নিস্তারঠাকরুন এসেছিলেন, একটা কাপড় ওঁকে তুই প্রণামি দিবি। থানকাপড় না হলে আমার খানাই দিয়ে দিতাম।

অরুণ বলে, তোমার গুরুঠাকরুন বলে? পুরুতবাড়িতেও তবে তো কাপড় দিতে হয়। রাখাল পরামাণিকের বউই বা কী দোষ করল?

যশোদা বললেন, এঁদের কাছে কেউ নয়। যখন তোর একফোঁটা বয়স, আচার্যিঠাকুর মশায় হাত গণে বলে দিয়েছিলেন—

হেসে উঠে অরুণেন্দু পূরণ করে দিল: রাজা নয়—সমস্ত আমার মনে আছে মা, ছোট্ট 'রাজা' কথা ঠাকুরমশায়ের গাল-ভরা হয়নি। বলেছিলেন, রাজরাজেশ্বর হবো, দিকপাল সম্রাট হবো।

তবে?

অরুণ বলে, হয়ে গেছি বুঝি তাই?

যশোদা ভংসনা করে বললেন, ঠাট্টা কিসের? সবে তো শুরু—আস্তকাল পড়ে আছে এখনো। সমস্ত হবে। আমি দেখতে পাই আর না-পাই, ঠাকুরমশায়ের কথা আমার আশীর্বাদ তোর দাদার এত আশা মিছে হয়ে যেতে পারে না।

বলছেন, দেশভুঁই ঘরবাড়ি ছেড়ে তোদের দু-ভাইকে বুকে নিয়ে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। ইষ্টদেবতার কাছে দিনরাত মাথা খুঁড়েছি: চোখ বুঁজবার আগে ওদের একটু স্থিতি করে দাও। নইলে মরেও আমার শান্তি হবে না। ঠাকুর কথা শুনেছেন—পড়শিরা এসে বলে, আমি রত্নগর্ভা। তোদের দু-জনকে নিয়েই বলে। মুখ্যু ছেলে বটে আমার পুন্ন, কিন্তু ফেলনা নয়।

কথা শেষ না হতেই অরুণ ফোঁস করে উঠল: পাশ করেনি বলেই বুঝি দাদা মুখ্যু? আমার চেয়ে বয়সে সে সামান্য বড়, কিন্তু জ্ঞানে-গুণে অনেক—অনেক বড়। দাদার মা হয়েই তুমি সত্যি সত্যি রত্নগর্ভা।

যশোদা বললেন, বড় বাসা খুঁজছিস শুনলাম—সবসুদ্ধ নিয়ে যাবি। সে যবে হয় হবে। সকলের আগে পুন্নকে বের করে নিয়ে যা দিকি। তুই বাড়ি এসেছিস, মেলা মানুষজন আসছে, দশ রকমে আজকে আমরা ভুলে রয়েছি। অন্যদিন, মাগো মা, পুন্ন বেরিয়ে গেল—আমি ছটফট করছি, বউটা মুখ চুণ করে ঘুরছে, বাড়ি যেন ঝিম

হয়ে থাকে। রাত্তিরে উঠোনে যেই ডাক দিল: মাগো, দুয়োর খোল—ধড়ে প্রাণ আসে তখন। নিত্যিদিন আমাদের এই ভোগান্তি। পুন্নর ঐ পোড়া রেলের-কাজ তুই আগে ছাড়িয়ে দে।

দেবো—। অরুণেন্দু বলল।

এমনি হয়েছে বাবা, আজকে পারিস তো কাল অবধি দেরি করা নয়। কত মানা করেছি। বলে, সংসার চলবে কিসে মা? ভাই রোজগারপত্তর করুক, এ-সব ছেড়েছুড়ে তক্ষুনি ভদ্দরলোক হয়ে যাব। এখন তো আর অজুহাত নেই। খরচটা কী আমাদের! বউমা আমাদের লক্ষ্মী আছে, অল্পে বিস্তর করতে পারে। বলবি তোর দাদাকে, হও ভদ্দরলোক যে রকম কথা আছে। কড়া হয়ে বলবি, তোর কথা ফেলতে পারবে না।

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পরে যশোদা ডাকাডাকি করছেন: মানুষজনের সঙ্গে সারাক্ষণ ভ্যানর-ভ্যানর করছিস—শুয়ে থাক একটুখানি চোখ বুঁজে। আমার ঘরে আয়।

শয্যায় পাশের জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, শো এইখানটা। লজ্জা কী রে—আমার চোখে সেই একফোঁটা ছেলেই তুই। মায়ের কাছে ছেলে বড় হয় না।

শুয়ে পড়তে হল পাশটিতে। সেই অনেক কাল আগে যেমন হত। ঘুম পাড়িয়ে রেখে মা রান্নাঘরে যেতেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে কেঁদে উঠত সে, ভয় করত একা একা। ছুটে আসতেন মা—শিশু মাকে জড়িয়ে ধরত, জোঁকের মতন লেপটে থাকত মায়ের গায়ে। আজকেও, মাগো, বড্ড ভয় করছে—একেবারে একা আমি। যারা সব জমিয়ে আছে, ফিরে তাকিয়ে কথাটাও কানে শুনতে চায় না। ছোট্ট বয়স হলে হাপুসনয়নে কাঁদতাম, কোলে চেপে ধরে তুমি শান্ত করতে। কারো কাছে কেঁদে একটু হালকা হবো, তা-ও আজ মানুষ পাইনে। তোমার কাছেও তো পারছিনে মা।

যশোদার এক হাত অরুণের গায়ে। মা মন্ত্র জানেন, হাত ছুঁইয়েই সর্বদুঃখ উড়িয়ে দেন। ছোটবেলা কতবার হয়েছে! বড় কান্না কাঁদছে, মা মাথায় হাত দিয়েছেন—কান্নাটান্না কোথায় গেল, মুখ ভরে হাসির ঝিলিক দিচ্ছে তখন। যাদুকর ছড়ি ছুঁইয়ে অঘটন ঘটায়—মায়ের হাতও তেমনি।

যশোদা বললেন, বাসা তো শুনলাম পাকাবাড়ি—

অরুণ বলে, কলকাতায় কাঁচাঘর আর ক'টা! এ জায়গার ঠিক উল্টো। দালানকোঠা এখানে দৈবেসৈবে দেখি—কলকাতায় তেমনি কাঁচাঘর দেখবার জন্যে হয়তো বা একক্রোশ পথ হাঁটতে হল।

ও বাব্বা!

বিস্ময়ের ধ্বনি দিয়ে মা চুপ হয়ে গেলেন। কাঁচাঘর দর্শনার্থীর পথ-কষ্ট ভাবছেন হয়তো।

পুনরপি প্রশ্ন: মা-গঙ্গা কদ্দূর তোর বাসা থেকে?

কাছেই—

নিশ্বাস ফেললেন যশোদা: বেল পাকলে কাকের কী? ঘরের একেবারে ছাঁচতলায় হলেও আমি তো নেমে ডুব দিয়ে আসতে পারব না!

মা-জননী ধরেই নিয়েছেন, এই তালপাতার কুঁজি বাতিল করে গঙ্গার কাছাকাছি কোন এক পাকাবাড়িতে অচিরে গিয়ে উঠছেন। এখন একমাত্র সমস্যা, শরীরের এই অবস্থায় গঙ্গাস্নানটা কোন্ কায়দায় চালাবেন।

সুপুত্র হয়ে পঙ্গু জননীকে অধিক আর দগ্ধানো কেন—অরুণ তাড়াতাড়ি সমাধান দিয়ে দিল: তুমি এমনি থাকবে নাকি মা, অসুখবিসুখ সেরে দুদিনে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। বড় বড় সার্জন আছে কলকাতায়, হাতখানা পাখানা কচাৎ কচাৎ করে কেটে তক্ষুনি আবার বেমালুম জুড়ে দেয়। হাড় কোনখানে একটু বেঁকে গেছে না ফেড়ে গেছে—এতো নস্যি তাদের কাছে।

[স্বপ্নেই যখন খাবি, চিঁড়ে-মুড়ি খাওয়া কেন রে হতভাগা,

রাজভোগ-ক্ষীরমোহন খা—চাঁদমোহনের মহামূল্য উক্তি।]

জোর দিয়ে অরুণ আবার বলল, কাছে না হয়ে গঙ্গা যদি দূরেই হয়, আমার মায়ের চান করা তার জন্যে আটকে থাকবে নাকি?

কথা সম্পূর্ণ না হতেই যশোদা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, সে তে ঠিক। পা ভাল হয়ে গেলে হেঁটেই চলে যাবো, দূর বলে আমি ডরাইনে। তিন ক্রোশ পথ ভেঙে মাদারের থানে কতবার গিয়েছি দেখিসনি।

জিভ কেটে অরুণেন্দু 'ছিঃ' বলে ওঠে: হাঁটতে যাবে কোন দুঃখে? গাড়িতে যাবে গঙ্গাস্নানে। দুটো লোক থাকবে সঙ্গে. ঘাট বড় পিছল, সাবধানে তারা ধরে নামিয়ে দেবে। এইটুকু হবে না—কী ভাবো তুমি আমায়?

অরুণেন্দু একেবারে কল্পতরু: গঙ্গাস্নানই বা কেন শুধু—কালীঘাটে যাবে, দক্ষিণেশ্বরে যাবে। ইচ্ছে হল, চিড়েখানায় ব গেলে একদিন দু-দিন। সিনেমাতেও যেতে পারো—জাগ্রত ঠাকুর-দেবতারা সব নড়েচড়ে বেড়াচ্ছেন। চড়বড় করে স্তম্ভ ফেড়ে নৃসিংহমূর্তি বেরিয়ে হুঙ্কার ছাড়বেন—

হামানদিস্তায় শাশুড়ির পান ছেঁচে এনে মলিনা দাঁড়িয়ে পড়েছে. অবাক হয়ে শুনছে। অরুণেন্দু বলছে, হুঙ্কার তুলে নৃসিংহমূর্তি হিরণ্যকশিপুর ঘাড়ের উপর এইসা এইসা নখ বসিয়ে দিয়েছেন, তখন সে তারস্বরে বিষ্ণু-স্তব করছে—তুমি যাবে মা, বউদিকেও নিয়ে যাবে—

গন্নাকাটা বউ উল্লাসের মুখে স্বরের ত্রুটি ভুলে গিয়ে একগাদা কথা বলে বসল: শুধু বউদি আর মা—আর বুঝি কারো যেতে নেই?

বুঝেও না-বোঝার ভান করে অরুণেন্দু বলে, খুকুও যেতে পারে। কিন্তু কিছুই সে বুঝবে না, ভয় পেয়ে যাবে উৎকট নৃসিংহমূর্তি দেখে।

তাই বুঝি! হেসে গড়িয়ে পড়ে মলিনা: বউদি-ই কেবল বুঝি বাসা জুড়ে থাকবে। বউদির বোন চাইনে? দু-বোন না হলে একা একা আমি কলকাতায় যাবো না। স্পষ্ট কথা

হাসতে হাসতে মলিনা চলে গেল।

বউদির বোন সংগ্রহ বাবদে যশোদারও বিন্দুমাত্র অমনোযোগ নেই। কন্যাদায়-মোচনের দায়ে আসে সব তাঁর কাছে, আমড়া-গাছি করে : ছেলেছোকরাদের মধ্যে ঐ এক হয়েছে দিদি আজকাল। কাজকর্ম না হলে খাওয়াব কি পরের মেয়ে এনে? পরের মেয়ে এসে যেন গন্ধমাদন খাবে! পরের মেয়ে এলেই যেন হাঁড়ি আলাদা করে দিচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে! অত বিদ্যে আর অমন রূপগুণ—ছেলে ছু-মাস ছ-মাসের বেশি পড়ে থাকবে না দেখতে পাবেন, লুফে নিয়ে চাকরি দেবে। আমাদের কথা তখন যেন মনে থাকে, টিপিটিপি অন্যত্র কথা দিয়ে বসবেন না।

এমনি কত কথাবার্তা হয়েছে আগে। তারা মাছির মতন—গন্ধে গন্ধে টের পেয়ে যায়, আলাদা খবর দিতে হয় না। কাল স্টেশনে এসে নেমেছে, রাতটুকু পোহাতে যা দেরি—নিস্তারঠাকরুন তাঁদের কলোনির ঋষি সরকারের ভাগনীর সঙ্গে সম্বন্ধ মুখে নিয়ে হাজির। পূর্ণ কাল বাড়ি থাকবে—সরকারমশায়রা এসে ছু-ভায়ের সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ-পরিচয় করে যাবেন। কনের বাপ তারপরে কলকাতায় অরুণের বাসায় গিয়ে দেখেশুনে আসবেন। কুটুম্বরা খাবেন এখানে, কিছু কেনাকাটার তো দরকার। আজ হাটবার আছে, সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে বেড়াতে যাস তো অরু হাটখোলায় একবার।

মায়ের হাতখানা নিয়ে অরুণ কপালের উপর রাখল। আ—! এই হাত চিরকালের সান্ত্বনা। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, কপালে চিড়িক পাড়ছে—মা হাত বুলোলে কে যেন চন্দন বেটে মাখিয়ে দিয়েছে মনে হত। কী হয়ে গেল—বিষ যে সেই হাতে! সর্বসন্তাপহারী মায়ের কোলে মহাজন যেন পাওনা-দেনার খতিয়ান নিয়ে বসেছে। হিসাব মেটাও, জোর তাগাদা।

মৃছু নাসাধ্বনি—ছুপুরবেলা যশোদা যৎসামান্য ঘুমোন। আস্তে আস্তে মায়ের হাতখানা নামিয়ে নিয়ে অরুণেন্দু উঠে পড়ল। বাড়ির

ত্রিসীমানায় নেই, জেগে উঠে মা আদর করে আবার না কাছে ডাকতে পারেন।

পূর্বরাত্রের প্রায় অর্ধেকটা এবং আজকের সারাদিনব্যাপী কসরত অন্তে সন্ধ্যার পর পূর্ণেন্দু বাড়ি ফিরল। তবু নাকি তাড়াতাড়ি ফিরেছে—ভাই একা একা আছে বলে কাজ ফেলে ফিরতে হল। হাত-পা ধুয়ে একটু জিরিয়ে নেবার পর অরুণেন্দু ডাকল: চলো দাদা, পশ্চিমবাড়ি থেকে পিঠে খাবার জন্য বলে গেছে।

পিঠে খাওয়া না হাতি—গলার স্বরেই পূর্ণ মালুম পেয়েছে। অরুণ আগে আগে যাচ্ছিল, খানিকটা এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে, তিনটে টাকা দাও আমায়। তার থেকে এই পয়সাগুলো ফেরত পাবে।

ঝুল-পকেটে যা-কিছু ছিল, মুঠো করে নিয়ে পূর্ণকে দিয়ে দিল। বলে, ভাইয়ের বিয়ে দেবার পুলক—ঠেলা বোঝ এইবার। কনের মামা কাল দেখতে আসছে, হাটখোলায় গিয়ে মিষ্টিমিঠাই কিনে আনলাম। কাজ তো তোমাদের—বাড়ি থাকলে তুমিই যেতে। তোমার বকলমে কেনাকাটা করে দিলাম। টাকা আমি কেন দিতে যাব—পাবই বা কোথা?

পূর্ণ প্রবোধ দেয়: বড্ড চটে গেছিস ভাই। আমি কেউ নই, বিশ্বাস কর, মা ক্ষেপে উঠেছেন আর সেই সঙ্গে মলিনা। বেটাছেলে একজন ফাঁকে ফাঁকে বেড়াচ্ছে সে ওঁরা দেখতে পারেন না। তা কাল দেখে যাবে বলে কালকেই তো আর বিয়ে নয়। লাখ কথার কমে বিয়ে হয় না—আস্তেব্যস্তে চলতে থাকুক কথাবার্তা। এখানেই হবে, তারও কোন মানে নেই—সম্বন্ধ এমন কত আসবে কত ভাঙবে। আমরাও গয়ংগচ্ছ করে চালিয়ে যাব। রাগারাগির কী আছে—এক বছর দু-বছরের আগে কোনখানে পাকাপাকি হচ্ছে না। তার মধ্যে একটা-কিছু জুটে যাবে নির্ঘাৎ।

ও তুমি কী বলছ, চাকরি তো জুটেই গেছে। চাকরি করছি, বাসা করেছি, ফ্ল্যাটের মধ্যে জানতে কারো বাকি নেই। মিথ্যে বানানোর এমন ক্ষমতা—ফৌজদারি-কোর্টের মোক্তার হলে না কেন দাদা? মক্কেলের ঠেলাঠেলি পড়ে যেত।

কণ্ঠস্বর কিছু উঁচু হয়ে থাকবে, ফিসফিসিয়ে পূর্ণ অনুনয় করছে: চুপ, ওরে চুপ—ওঁদের কানে গিয়ে না ওঠে। একেবারে মিথ্যেই বা কিসে হল? খাতা লেখা জিনিসটা সামান্য হলেও চাকরি তো বটে। পাঁচজনে মিলেমিশে যে ঘরটায় থাকিস, তাকেও কি বাসা বলা যায় না? এটুকু করতে হল মায়ের জন্য। শরীরের যা দশা, দু-মাস ছ-মাসের বেশি উনি বাঁচবেন না। সারা জন্ম দুঃখধান্দা করে অন্তিমে আমাদের মুখ তাকিয়ে আছেন। আমি নই—আকাটমুখ্যু আমায় দিয়ে কিছু হবে না দুনিয়াসুদ্ধ জানে—একলা তুই, আশাভরসা তোর উপরে। আশার পূরণ হয়েছে, লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে তারপর ভাল কাজকর্মও পেয়ে গেছিস, অভাবঅনটন ঘুচে সংসার এতদিনে লক্ষ্মীমন্ত হল—এই তৃপ্তি নিয়ে ওঁকে যেতে দে। একটু মিথ্যাচার তাতে যদি হয়েই থাকে, ঠাকুর সে পাপ হিসাবে নেবেন না।

একটু থামল। তারপর জোর দিয়ে বলল, না, মিথ্যে কিছু নেই এর মধ্যে। যা হবেই, হয়ে গেছে বলে তাই একটুখানি এগিয়ে দেওয়া।

ম্লান হেসে অরুণ বলল, হবে বলে জেনেবুঝে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে আছ দাদা?

দৃঢ়স্বরে পূর্ণ বলল, হতে বাধ্য। হাড়ভাঙা খাটনি খেটেছিস—গায়ে একটা ভালো জামা ওঠেনি, পেটে একটু ভালো জিনিস পড়েনি। খেটে খেটে খেটে সর্বরকমে নিজেকে গড়ে তুললি। তোর কাজ তুই করেছিস—যারা কাজকর্ম দেবার মালিক, তাদের কাজ ঠিক-জায়গাটিতে তোকে এবার নিয়ে বসানো। এমন বিদ্যেবুদ্ধি শক্তি-সামর্থ্য বিনি-কাজে নষ্ট হবে—হতে পারে তাই কখনো! বিদ্যে হয়েছে

সেটা মা দেখলেন, সর্বসুখ হয়েছে সেটা দেখা পরমায়ুতে বেড় পাবে না হয়তো। ভবিষ্যতের কথাটা তাই 'হয়ে গেছে' বলে চালিয়ে যাচ্ছি।

অরুণেন্দু বলল, বউদিদির কাছেও তো চালিয়েছ। সত্যি কথা তাঁকে অন্তত বলতে পারতে। বলে সামাল করে দিতে মায়ের কাছে ফাঁস না করেন।

সে-ও বড় দুঃখী রে, তারও মোটে সবুর সইছে না ভাই। মা মরেছে যখন সে তিন মাসের মেয়ে, বাবা মরেছে যখন সে তিন বছরের। বৈমাত্রেয় ভায়ের সংসার—ভাই যেমন হোক, ভাইয়ের বউ চক্ষু পেড়ে দেখতে পারে না। ভূতের মতন খাটতে পারে বলে সংসারে রেখে ভাত-কাপড় দিচ্ছিল, নইলে বোধহয় পথেই বের করে দিত। তার উপরে খুঁতো-মেয়ে—কথা শুনে সবাই ভ্যাংচায়। এক এক পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখতে আসত, এসে পালানোর দিশা পায় না। আমাকে পেয়ে কাঁধের বোঝা নামিয়ে ভাই বেঁচে গেল। চিরটা কাল মলিনা অশান্তি ভোগ করে এসেছে—দিয়ে দিলাম একটু আনন্দ। ক্ষতি কি তাতে?

অরুণ নিশ্বাস ফেলে বলে, বাড়ি এসেছি—তা-ও যেন দাবানলে ঘিরে ধরেছে। মার কাছে নয়, বউদির কাছে নয়—দাদা, আমি কার কাছে বসে বুকটা একটু হালকা করি বলো তো?

পিঠে খাওয়া-টাওয়া বাজে। উদ্যত অশ্রু চেপে পরের বাড়ি পিঠে খেতে বসা যায় না। নিজের বাড়িতেও না। খেতে খেতে দুই গালের উপর হয়তো-বা ধারাস্রোত বইল, সামলানো গেল না। তখন শতেক প্রশ্নের জবাব দাও, হরেক অজুহাত বানাও।

নির্জন পথে এদিকে-সেদিকে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে বাড়ি ফিরে চলল আবার দু-ভায়ে।

অরুণেন্দু বলে, হাত জড়িয়ে ধরে আমায় বাড়ি নিয়ে এসেছ। খপ করে হাত জড়িয়ে ধরা মোক্ষম অস্ত্র তোমার দাদা। সেই অনেক দিন আগে আরও একবার অমনি হাত ধরেছিলে, মনে পড়ে—

কলকাতায় পাঠিয়েছিলে প্রেসিডেন্সিতে পড়বার জন্য? কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। আবার এই হাত ধরে বাড়ি নিয়ে এলে—কাঁদতে কাঁদতে পালাতে হচ্ছে। এত অভিনয় পারছিনে আর আমি।

আরও একটা দিন অন্তত পক্ষে থেকে যেতে হয়। আত্মারাম আচার্য মশায় নেমন্তন্ন করলেন: গরিবের বাড়ি দুটো ডালভাত খেয়ে যাবে, দু-ভাই যাবে তোমরা।

বুড়োমানুষ ভিন্ন পাড়া থেকে নিজে চলে এসেছেন। শুধুমাত্র গুরুঠাকুর নন, এই একটি পরিবারের সঙ্গে বিশেষ দহরম-মহরম তাদের। বাপের আমলে, যখন দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে আসে নি, তখন থেকেই। কাজের ক্ষতি বলে অরুণেন্দু অনেক কাকুতিমিনতি করল, তিনি নাছোড়বান্দা: না বাবা, মনে বড় ব্যথা পাবো। ছেলে দুটো তো মানুষ নয়—ঘুরে ঘুরে এক-হাতে হাটবাজার করেছি।

ভালবাসেন এদের সত্যিই, কিন্তু উদ্দেশ্যও কিছু আছে। পাশাপাশি দু-ভাই খেতে বসেছে, হুঁকো নিয়ে সামনে বসে আচাযিমশায় 'এটা খাও' 'ওটা খাও' করছেন। তার মধ্যে খপ করে ছেলের কথা নিয়ে এলেন: ব্রাহ্মণসন্তান হাটে হাটে বিড়ি বেচে বেড়ায়। বিদেশ বলেই সম্ভব হচ্ছে, তা বলে এটা তো ভাল কথা নয়—

অরুণেন্দু বলে, আজকাল আর এ সমস্ত দেখতে গেলে চলে না। রোজগার করছে তো বটে।

পরিবেশন করছেন নিস্তারঠাকরুন। মুখ বেঁকিয়ে তিনি বললেন, রোজগার তো ভারি! নুন থাকে তো চাল থাকে না—

যা দিনকাল, এই বা ক'টা ছেলে পারছে বলুন।

ঠাকরুন বলে যাচ্ছেন, লেখাপড়া শেখেনি তোমার মতন, বড়

কাজকর্ম কে আর দিচ্ছে—

(শেখেনি ভাগ্যিস !)

আত্মারাম ঠাকুর সোজাসুজি বললেন, বড় ছেলেটা যা করছে তাই নিয়ে থাকুক, ছোট্টুকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাও। শহরে-বাজারে বিনি লেখাপড়ার কাজও কত আছে, কলকারখানায় কাজকর্ম শিখিয়ে নেয় শুনেছি। বিড়ি বাঁধার ভবিষ্যৎটা কি ?

ঠাকুর-ঠাকরুনের দু-জোড়া চোখ সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। জবাব কি দেবে অরুণ, ঘাড় নিচু করে খেয়ে যাচ্ছে। অদূরে ছোটছেলেকে দেখতে পেয়ে ঠাকরুন ডেকে বললেন, অরুর সঙ্গে তুই কলকাতায় চলে যা। সেই কথা হচ্ছে। এরা দু-ভাই বড্ড ভালো, একটা-কিছু করে দেবেই। বেশ ভালো হয়ে থাকবি।

অরুণেন্দু আঁতকে ওঠে, এখনই একেবারে সঙ্গে সঙ্গে রওনা করে দিতে চান। অলক্ষ্যে রুষ্ট চোখে একবার পূর্ণেন্দুর দিকে তাকাল : বিপত্তি তোমারই জন্যে দাদা।

আত্মারাম বলছেন, একজন বড় হলে দশজনে তার কাছে প্রতিপালিত হয়। আমরা তো বুড়োঅথর্ব হয়ে পড়লাম, ছোঁড়া-দুটোকে তোমরা ছাড়া কে দেখবে ?

অরুণ এতক্ষণে বলবার কথা কিছু ভেবে পেয়েছে। বলল, এবারে থাক। শিগগিরই বড় বাসা নিয়ে নিচ্ছি—মা ওঁরা সব যাবেন, ছোট্টু তাঁদের সঙ্গে যাবে। কলকারখানায় কোথায় কি সুবিধা হয়, আমিও এর মধ্যে খোঁজখবর নিতে থাকি।

ফিরছে দু-ভাই। অরুণ বলল, বাড়ি এসে দু-দিন জিরোব, সে পথও মেরে দিয়েছ দাদা। পালাই-পালাই ডাক ছাড়ছি।

॥ সাত ॥

যথাপূর্ব চলেছে একঘেয়ে উমেদারি। সবিস্তর বলতে গেলে লোকে কানে হাত চাপা দেবে, গল্পে ঢোকাতে গেলে সেই পাতাগুলো ফসফস করে উলটে চলে যাবেন পাঠক। দোষ দিইনে—হা-হুতাশ দেখে দেখে আর শুনে শুনে মানুষের চোখ-কান পচে গিয়েছে। যতক্ষণ ভুলে থাকতে পারি, ততক্ষণ ভাল।

সুন্দর চেহারা, প্রদীপ্ত যৌবন, বুদ্ধি আছে, বিদ্যেও বেশ খানিকটা কবজায় এনে ফেলেছে—নিঠুরা চাকরি-সুন্দরী তবু মুখ লুকিয়ে আছেন, খুঁজে খুঁজে খুঁজে হয়রান।

লোহাপটির সুবিখ্যাত রঘুনাথ গুঁই, বিশাল ভুঁড়ি, মোসাহেবগুলোকে ঠেলে সরিয়ে অরুণেন্দু তাঁর সামনাসামনি দাঁড়াল: উমেদার এলাম—

কী করেন আপনি?

বললামই তো। উমেদারি।

কাজকর্ম কী করা হয়, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

উমেদারিই আমার দিন আর রাত্রির কাজকর্ম।

রঙ্গ করবেন না—

তোফা আছেন কিনা, উমেদারি জিনিসটা আপনার কাছে রঙ্গ বলে ঠেকে। রাতদুপুর অবধি দরখাস্ত লিখি—লিখতে লিখতে আঙুলে কড়া পড়ে গেছে, টিপে দেখুন। সেই দরখাস্তের পাহাড় সকালবেলা ডাকে ছেড়ে সারা দিনমান শহরময় হুড়্‌ড-হুড়্‌ড করে বেড়াচ্ছি। উমেদারি রাত-দিনের কাজ, মিছে কথা বলিনি।

ভুঁড়িদাস রঘুনাথ উপদেশ ছাড়লেন : রোগই তো এই। চাকরি-চাকরি করেই বাঙালিজাত মরবে। চাকরি তো চাকরগিরি—জীবনে কখনো চাকরি করিনি—ঘেন্না করি চাকরিকে। আমি, জানেন, কী অবস্থা থেকে—

অরুণের চোখ-মুখ লাল। বলে, জানি—

কী করে জানলেন? চেনাশোনাই তো নেই আপনার সঙ্গে।

বলে যাচ্ছি, মিলিয়ে নিন। অতি-সামান্য অবস্থা থেকে আপনি এত বড় হয়েছেন। পেটের ভাত জুটত না, বললেই হয়। পি. সি. রায়ের বক্তৃতা শুনেছিলেন একদিন—উঁহু, সে পি. সি. রায় আপনাদের পটির পালানচন্দ্র রায় নন। আচ্ছা, পি. সি. রায় থাকুন গে—মোটের উপর আপনি সঙ্কল্প নিলেন, পরের গোলামি কিছুতেই নয়। তারপর অমানুষিক কষ্টস্বীকার করে, যত্ন চেষ্টা আর অধ্যবসায়ের গুণে—কেমন মিলছে না?

সবিস্ময়ে রঘুনাথ বললেন, বাঃ রে, ঠিক ঠিক বলে যাচ্ছেন। জানলেন কী করে আপনি?

সব শিয়ালের এক রা—আলাদা করে জানতে হয় না। শিয়াল যখন, হুকা-হুয়া ঠিক একই রকম বেরুবে। লোহাপটিতে তৈলদান আজকে ধরে তিনদিন হয়ে গেল, দর্শন ডজনের উপর হয়ে গেছে, সর্বমুখে একই কথা : সামান্য থেকে বড় হয়েছেন।

রঘুনাথ রাগ করে বললেন, বলতে চান মিথ্যেকথা বলছি?

আরে সর্বনাশ, একেবারে নির্জলা সত্যি। তবে সকলের বড় সত্যি যে বড়লোক হয়েছেন। তারই সঙ্গে জ্ঞান বুদ্ধি পাণ্ডিত্য ডাইনে-বাঁয়ে উপদেশ ছড়ানোর এক্তিয়ার সবকিছু আপনাআপনি এসে যায়।

কারবারি লোকের রূঢ় হতে নেই। ঘাড় তুলে রঘুনাথ অন্য একজনের উপর হাঁক পেড়ে উঠলেন : উঃ, ছারপোকায় কামড়াচ্ছে। গদি তুলে কাল রোদ্দুরে দিবি, ভুল হয় না যেন।

অচঞ্চল অরুণেন্দু একসুরে বলে চলেছে, আর আমি যত পাশই

করি মূর্খস্য-মূর্খ ছাড়া কিছু নই। নির্বোধ কাণ্ডজ্ঞানহীন পয়লা নম্বরের হাঁদারাম।

মনের মতন কথাটি পেয়ে রঘুনাথ কিছু শোধ নিয়ে নিলেনঃ তাই যদি না হবেন—এত লোকে করে খাচ্ছে, আপনিই বা পারেন না কেন? বলবেন, নিজের কথাই সাতকাহন করে বলছে—কিন্তু এক-শ সাতাশটি টাকা সর্বসাকুল্যে আর এই হাত দু-খানা আর মাথার বুদ্ধি—মোটমাট এই পুঁজিতে এত বড় কারবার গড়ে তুলেছি। কেউ সাহায্য করেনি।

করেছে—দৃপ্তকণ্ঠে অরুণেন্দু বলল।

আমার চেয়ে বেশি খবর রাখেন দেখছি আপনি।

রাখেন আপনিও। স্বীকার করেন না। অথবা নিজের হাত দুটো আর মাথা নিয়ে এতই অহঙ্কার, তার দয়াটা তলিয়ে দেখেন না।

রাগে আগুন হয়ে রঘুনাথ বললেন, কে দয়া করল আমায়? কেউ নয়। চ্যালেঞ্জ করছি, নাম বলুন।

হিটলার—

অবাক হয়ে রঘুনাথ তাকিয়ে পড়েন—কাজকর্ম না পেয়ে ছোঁড়া পাগল হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহ তাই, কথাবার্তা সেই রকমই বটে।

অরুণ বলে যাচ্ছে, লড়াই বাধিয়ে দুনিয়া লণ্ডভণ্ড করে দিল। তারপরে কত গবেট রাতারাতি মহামান্য মুরুব্বি হয়ে উঠল, কত ফকির মসনদে চড়ল—তড়িঘড়ি যে যদ্দুর গুছিয়ে নিতে পেরেছে। ওলটপালট আবার একটা এলে আমাদের পালা—তখনই যদি একটা মওকা পেয়ে যাই। এমনিতে কিছু হবে না, খাটাখাটনি বিস্তর করে দেখলাম।

উৎকৃষ্ট একখানা চেহারা আছে। বিধাতার দেওয়া নির্ভেজাল মাল—অবহেলা অযত্নে খুব একটা মরচে ধরে না। এই বাবদে কিছু

মেয়ে আশেপাশে ঘুর ঘুর করে। অরুণ পাত্তা দেয় না—উমেদারির তালে ব্যস্ত, কাব্য করার সময় কখন? সামনাসামনি পড়লে হুঁ-হাঁ দিয়ে সরে পড়ে।

কয়েকটা বিষম নাছোড়বান্দা। পলি একটি। ক্ল-ফলার মতো লেগে আছে। ক্ল-ফলা কথাটা যশোদা খুব বলেন, ছোটবেলা থেকে শুনে শুনে অরুণ শিখেছে। খাসা কথা। ঋ-কার ক-এর সঙ্গে জুড়লে ফলাটা অক্ষরের পিছনে সেঁটে থাকে, তেমনি। পলিকে একদিন বলেই ফেলেছিল, ক্ল-ফলা হয়ে আছেন আপনি। পলি জিজ্ঞাসা করল: ক্ল-ফলা মানে কি? ব্যাখ্যা করেনি অরুণ, ভদ্রতায় আটকাল। দু-তিন বার পলি জিজ্ঞাসা করল: বললেন না তো ক্ল-ফলার মানে? অরুণ বলল, অনেক বোঝাতে হবে। বাইরে বেরুব এখন, তাড়া আছে। আর একদিন।

ঘোড়ার-ডিম! কাজ একটাই এখন—দরখাস্ত রচনা করা। সে কাজ ঘরের মধ্যে খাটিয়ার উপর বসে, বাইরে বেরুতে হয় না তার জন্য। তাড়া দেখানোর জন্য ব্যস্তসমস্ত ভাবে জামাটা গায়ে ঢুকিয়ে অরুণ উঠে দাঁড়াল। বিরস মুখে পলিও উঠল অগত্যা। রাস্তায় চলে এলো, পলিও আছে পিছুপিছু।

ট্রামরাস্তায় পলি যাবে জানা আছে, অরুণেন্দু উল্টোদিকে পা বাড়িয়ে বলে, নমস্কার, আমি ওইদিকে যাচ্ছি। পলি আর কী করে—বলল, নমস্কার! খুট খুট করে ট্রাম ধরতে চলল।

এদিক-সেদিক অল্পসল্প ঘোরাঘুরি করে অরুণ ফিরে এলো। উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে টুক করে চাঁদ-কেবিনে ঢুকে গেল। আধ কাপ চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নেবে।

টেবিল হৈ-হৈ করে উঠল—কোণের দিকে দলটার নিজস্ব টেবিল। অরুণের গতিবিধি লক্ষ্য করেছে তারা।

সুকুমার বলল, মেয়েছেলেয় এত তরাস? কাবলিওয়ালা হলেও তো আমি এতদূর করিনে।

চাঁদমোহন এসে পড়ল এদিকে। সে বলে, অমন করতে নেই রে,

মাণিক-রতন কোথায় কি আছে, কে জানে। 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই—'

ছাই নয়, কয়লা।

পলির গাত্রবর্ণের ইঙ্গিত। সুকুমার টিপ্পনী ছাড়ল: ঐ কয়লা-বরণীকে পাশে বসিয়ে পাকা একটি ঘণ্টা গোটা ভবানীপুর মোটরে চক্কোর মেরেছি। ভয় পাইনি। তা হলে তো হাত-টাত কেঁপে রাস্তার মানুষ দু-চার গণ্ডা সাবাড় হয়ে যেতো।

অ্যাঁ, পাশে বসিয়ে ঘোরাঘুরি? বলিস নি তো।

রোমান্সের গন্ধে দলের সবগুলো কান খাড়া হয়েছে। বলে, খুলে বল্। চেপে গেলে তোকেই সাবাড় করব বারোয়ারি মার মেরে।

না, চাপাচাপির কিছু নেই। সে গাড়িতে পলি ছিল, পলির দিদি ডলি ছিল, এককোঁটা ছোটভাইটা ছিল, বাপ কাশীনাথ কর মশায় ছিলেন। পলির মা কেবল বাদ। পুরোনো গাড়ি কিনলেন ওঁরা, গাড়ির ট্রায়াল হচ্ছিল। যোগাযোগ করে দিয়ে সুকুমার দেড়শ টাকা দালালি পেয়েছে।

মোটরগাড়ি কিনল?

অরুণেন্দু লাফিয়ে ওঠে: হোক না লঝ্ঝড় গাড়ি, তা হলেও গাড়িওয়ালা ভদ্রলোক। ঠিকানা দে, কোন অফিসে কাশীনাথবাবুর চাকরি। 'যেখানে দেখিবে ছাই'—লাখকথার এক কথা। এবারে পলি এলে বাছা বাছা মিষ্টিবচন ছাড়ব। আসবে কি না, কে জানে। মেয়েটা অতিশয় ঘড়েল—ঘনিষ্ঠতা অরুণ পছন্দ করছে না, সেটার বেশ আন্দাজ পেয়ে গেছে।

আত্মগ্লানিতে পুড়ছে সে এখন। পুরানো উমেদার হয়েও শাস্ত্রটা এখনো ঠিকমতো রপ্ত হল না। কাউকে হেলা করতে নেই—ছাইগাদার তলেও মাণিক-রতন লুকিয়ে থাকতে পারে। যুবতী মেয়ে এলে মারমুখী হবে, উমেদারের পক্ষে অভ্যাসটা অতিশয় গর্হিত। চাকরির খাতিরে মেয়ের সঙ্গে মিষ্টি কথা কি—গদগদ প্রেমালাপ, চাই কি বিয়েয় পর্যন্ত রাজি। নিজে হদ্দমুদ্দ খাটছি, সঙ্গে বরঞ্চ

উকিল রূপে একটা ছুটো মেয়ে ধরো। তারাও গিয়ে গিয়ে আমার হয়ে খোশামুদি করুক। রাস্তাঘাটে ট্রামে-বাসে মেয়েছেলে গিজগিজ করছে, তা সত্বেও পুরুষের কাছে মেয়ের একটা আলাদা খাতির—বিশেষত ভারিক্কি বয়সের যেসব পুরুষ। এবং চাকরিদাতা সাধারণত তাঁরাই। যৌবনে মেয়েদের তেমন কাছাকাছি হতে পারতেন না, তাঁদের চোখে তরুণী মেয়েরা অদ্যাপি হুরী-পরী।

সুব্রতা মেয়েটা কিছু বেশি রকমের বেপরোয়া। গলির মোড়ে চকোলেট কিনে খাচ্ছে, অরুকে পেয়ে খানিকটা ভেঙে তার হাতে দিয়ে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল। আর অরুণও আজ হাসিমুখে পরম বশম্বদ ভাবে চলেছে।

ঐ গলিতেই বাড়ি। বাড়ি নিয়ে তুলে হৈ-চৈ করে মাকে ডাকল, বোন ছুটোকে ডাকল। মা কেমন যেন লোলুপ চোখে তাকাচ্ছেন।

সুব্রতা বলল, কলেজের বন্ধু। অনেকদিন পরে দেখা। পাড়ার মধ্যে পেয়ে গেছি আজ, পালালে 'চোর' 'চোর' রব তুলে দিতাম।

বয়স্থা মেয়েকে আজকাল নাকি টিপে দেওয়া থাকে : পছন্দসই ছেলে পেলে ধরেপেড়ে বাড়ি নিয়ে আসবি, আমরাও দেখব। আর অরুণেন্দুর এলেম যত সামান্যই হোক, বাইরেটা রীতিমতো চটকদার—দেখলে পলক পড়ে না চোখে। করবন্ধনে বেঁধে সুব্রতা জননী সকাশে হাজির করল—কী মতলব আছে, কে জানে!

গৃহবন্দিত্বে মুক্তি নিয়ে মেয়েরা এখন মুক্তবায়ুর শ্বাস নিচ্ছে। উত্তম। কিন্তু উল্টো এক সমস্যা তাদের জীবনে। অপরিচয়ের একটা রোমান্স ছিল তাদের সম্পর্কে—আড়াল সরে গিয়ে সেই বস্তুও ঘুচেছে। সংসারের ডাল-ভাত-চচ্চড়ি এবং আর দশটা উপকরণের মতন মেয়েরাও। তা-ও নয়—ডাল-ভাতের খরচা এ-বাজারে যথেষ্ট বেড়েছে বটে, তবু বউয়ের খরচার ধারেকাছে যায় না। বউ পোষা আর হাতি পোষা একই কথা—জনপ্রবাদে বলে। হাতি পোষার

রাজারাজড়া ইদানীং বড় একটা মেলে না। তেমনি যারা গোটা বউ পুষে সংসারধর্ম করবে, এমন দুঃসাহসী যুবাপুরুষ দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া আজকালকার মেয়ে যেহেতু বিয়ের-কনে মাত্র নয়, পুরোদস্তুর মানবী—তাদের নিজ চোখের পছন্দ-অপছন্দেরও একটা ব্যাপার আছে। ফলে বিয়েই হয় না বিস্তর জনার। তখন অতিশয় করুণ অবস্থা—নাক-সিঁটকানো সম্পূর্ণ উপে গিয়ে হাত-পা-মুণ্ড সমন্বিত শুধু একটা বর পেলেই হল। তা-ও হয় না—যেহেতু ইতিমধ্যে বয়সের ভাঁটা সরে গিয়ে কাদামাটি বেরিয়ে পড়েছে, প্রেমিকার সঙ্গে মধুরালাপ চোখ বুঁজে করতে হয়, চোখ মেলে থাকলে ধাক্কাধাক্কি করেও কণ্ঠ দিয়ে গদগদ স্বর বের করা যায় না। বহুদর্শী মায়েরা মেয়েকে তাই নাকি সতর্ক করে দেন: বাছাবাছি বেশি করতে যাবি নে—বেশি যে বাছে, তারই শাকে পোকা।

অরুণেন্দুর অবশ্য শোনা কথা এসমস্ত। কিন্তু সুব্রতার এত হৈ-চৈ, সন্দেহ হয়, শিকার কবলিত করার উল্লাস কিনা। মা-জননী একনজরে দেখছেন। এতক্ষণ ধরে এত খুঁটিয়ে কী দেখেন—বহিরঙ্গ শেষ করে এখন সম্ভবত অন্তর্লোকে এক্স-রে চালাচ্ছেন।

অরুণেন্দু ঘেমে উঠেছে। পরিচয় নিষ্কাশন শুরু হয় বুঝি এবারে—কোথায় থাকে সে, সংসারে কে কে আছে, কী কাজকর্ম করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। শতেক উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়ায়—হেন অবস্থার মধ্যেও কন্যার পিতামাতার কবলে ইতিপূর্বে সে পড়েছে, পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। মানরক্ষার্থে তখন চটপট অবাস্তব বিবরণ রচনা করে জবাব দিয়ে যেতে হয়। সুব্রতার কাছে দু-দশ মিনিট কাটিয়ে মুফতে এক কাপ চা খেয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল, চায়ের তেষ্টা পেয়েছেও খুব। কিন্তু সেই এগারোটা বেলা থেকে অফিস-কর্তাদের সম্পর্কে বানিয়ে বানিয়ে খোশামুদির পর এখন আবার নিজের সম্পর্কে বানানোর মনমেজাজ নেই।

তাড়াতাড়ি নমস্কার সেরে বেরিয়ে পড়ল: আজকে ভারি ব্যস্ত, আর এক দিন এসে গল্পগাছা করব।

এসো বাবা, তাই এসো। রবিবার সকালের দিকে এসো, উনিও থাকবেন।

বলা বাহুল্য রবিবারে অরুণ যায় নি। কোন বারেই নয়। ও-বাড়ির চৌকাঠ আর মাড়াবে না।

সুব্রতার সঙ্গে, তা বলে, দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ নয়। সুব্রতা বলে, নিজের ক্ষমতায় হবে না রে, সে তো হদ্দমুদ্দ দেখলি। উকিল ধর্ একটা। উকিল হয়ে আমি তোর আগে আগে যাচ্ছি—

হেসে উঠে বলে, কাজ হাসিল করে দিই আগে। ফী বাবদ যা তোর ধম্মে আসে, দিস আমায়।

বলে মুখ টিপে কিঞ্চিৎ চটুল হাসি হাসল।

জাঁদরেল সম্পাদক, কলমে আগুন ছোটান। দেশের কী নিদারুণ সঙ্কট এমনি যদি মালুম না পান, তাঁর লেখা এডিটোরিয়াল হপ্তাখানেক পড়ুন—করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করবেন।

আড়াইটে নাগাদ অফিসে আসেন তিনি। খানিকটা সময় নিষ্কর্মা। চতুর্দিকে বহু লোক ঘিরে থাকে তখন। সহকারী ও সুহৃৎজনেরা থাকে, বাইরে থেকেও অনেকে আসে বিবিধ সভানুষ্ঠানে সভাপতিরূপে গাঁথবার অভিপ্রায়ে। সম্পাদক সভাপতি হলে আর দেখতে হবে না—কাগজে ফলাও করে সচিত্র রিপোর্ট বেরুবে। বক্তৃতায় যা-কিছু বলবেন সবই থাকবে, যা বলবেন না তা-ও থাকবে। বিকেলের এই সময়টা মেজাজে থাকেন সম্পাদক, জমিয়ে আলাপ-আলোচনা চলে।

যাবতীয় আলোচনা ঘুরেফিরে তাঁরই গুণগানে এসে পৌছয়। জাতির পরিত্রাতারূপে আবির্ভাব তাঁর, মানুষ আজ কেবল তাঁরই মুখ চেয়ে আছে। কিন্তু সকালের এডিটোরিয়াল আজ তেমনধারা দানা বাঁধেনি।

এক সহকারীর দিকে মিটিমিটি হেসে সম্পাদক বলেন, তাই নাকি?

আপনি লিখেছেন?

কলম ধরে না লিখলেও আমার লেখা তো বটেই।

তা বুঝেছি। ও-কলমের মাল নয়, দুটো লাইন পড়েই ধরে ফেলেছি।

সম্পাদক স্বীকার করলেন: কাল মীটিং ছিল মফস্বলে। দুপুরে একটু গড়াতেও দেয়নি, টেনে নিয়ে বের করল। এডিটোরিয়াল প্রশান্তর লেখা। কিন্তু প্রশান্ত খারাপ লেখে না তো।

ভদ্রলোক আমতা-আমতা করেন: না, খারাপ কেন হবে! অন্য সব কাগজে যা বেরোয়, সে তুলনায় হীরে-মাণিক। তা হলেও খাঁটি দুধের স্বাদ ঘোলে মিটবে কেন? আজকে স্যার, নিজে একখানা ছাড়ুন।

হবে তাই, নিশ্চিন্ত হয়ে যান। কিন্তু বয়স হয়ে যাচ্ছে, কদ্দিন আর পারব। কী যে করবে এরা সব তখন!

ঘরের সংলগ্ন বাথরুম। অনুরাগীদের আশ্বস্ত করে সম্পাদক বাথরুমে ঢুকে গেলেন। অর্থাৎ গৌরচন্দ্রিকা শেষ। যে যার জায়গায় গিয়ে কাজে বোসো গে, বাইরের লোক সব ভেগে পড়ো। বেরিয়ে এসে সম্পাদক এবারে কলম ধরবেন।

বাথরুমে বড্ড দেরি হচ্ছে, দরজা আর খোলে না। অনিল খুশি আর ধরে রাখতে পারে না: যা মোক্ষম একখানা আজ হবে!

দ্বিধায় ঘাড় নেড়ে প্রশান্ত বলে, উল্টোটাও হতে পারে। বেরিয়ে হয়তো ইজিচেয়ারে গড়িয়ে পড়বেন: শরীর ম্যাজ-ম্যাজ করছে, উঠতে পারছি নে। আজকেও তুমি চালিয়ে দাও হে প্রশান্ত—

এমনি সব জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে—বাইরে মিছিল। অগণ্য নরকণ্ঠ চতুর্দিক কাঁপিয়ে তুলছে: ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

সম্পাদক ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন: কী আবার আজকে! দেখ তো, দেখ তো—

ইনক্লাব জিন্দাবাদ! পাশ করেছি, চাকরি দাও। চাকরি, নয়তো বেকার ভাতা।

সম্পাদক বললেন, কী নিয়ে লিখি ভাবছিলাম। ঠিক হয়েছে।

কলম বাগিয়ে বসেছেন, চুরুট ধরিয়েছেন। স্লিপ হাতে বেয়ারা দোর ঠেলে ঢুকে পড়ল।

সম্পাদক খিঁচিয়ে উঠলেন: লেখার সময় দেখা হয় না, বলে দিতে পারলে না?

বেয়ারা বলল, কী করব—নাছোড়বান্দা। স্লিপ না আনলে এমনিতেই ঢুকে যেত।

জুলুম নাকি? ঘাড়-ধাক্কা দাও গে।

বেটাছেলে হলে যা-হয় হত। আওরত-মানুষ।

স্লিপে চোখ বুলিয়ে সম্পাদক অতএব নরম হয়ে বললেন, নিয়ে এসো। ঝগড়া করে ওদের সঙ্গে তো পারা যাবে না। বিদেয় করে কাজে বসব।

সুব্রতা এসে ঢুকল: আওয়াজ শুনতে পান?

হরবখত শুনছি, নতুন করে কী শুনব। এ সব ডাল-ভাতের শামিল হয়ে গেছে।

বেকারের দল বেরিয়েছেন। চাকরি চাই।

চেঁচালেই বুঝি চাকরি দেবে?

সুব্রতা বলে, ওঁরা চেঁচান, আপনারা লিখুন। উপরওয়ালাদের সুখনিদ্রা যদি ভাঙে। যুবকদের আজ কী সর্বনেশে অবস্থা, যদি তাঁদের মালুমে আসে।

সম্পাদক বললেন, কি লিখতে হবে, আপনি কি আমায় উপদেশ দিতে এসেছেন?

না। রাস্তা যে স্লোগানে তোলপাড় হচ্ছে, ঘরের মধ্যে আমারও সেই দরবার। চাকরি দিন একটা।

থতমত খেয়ে সম্পাদক বললেন, কি চাকরি?

যে-কোন চাকরি। আমি নই, আমার এক ভাইয়ের জন্য।

সম্পাদক বললেন, নিজেই তো চাকরি করি—চাকরি দেবার মালিক আমি নই। আমারই ছেলে বি-কম পাশ করে বসে আছে।

আমার ভাই এম-এ পাশ করে বসে আছে।

সম্পাদক বললেন, এম-এ আমাদের এখানে লাগে না। কলেজের মাস্টারি হলে এম-এ লাগত।

সুব্রতা বলে, ভাই আমার বি-এ পাশ, ইণ্টারমিডিয়েট পাশ, ইস্কুল-ফাইন্যাল পাশ। যতটা লাগে হিসাবের মধ্যে নিয়ে বাড়তি বাতিল ধরবেন।

ওসব নয়। জার্নালিজমের ডিপ্লোমা দেখে নেওয়া হয় আজকাল।

সুব্রতা বলে, তা-ও বোধহয় আছে। দু-চোখে যা পড়ে, কোন শেখাই সে বাকি রাখে না। বলে, চাকরিতে লাগতে পারে। বসুন, ডেকে আনি।

অরুণেন্দু মুকিয়ে ছিল, দরজা ফাঁক হতেই ঢুকে পড়ল।

সুব্রতা বলে, জার্নালিজমের ডিপ্লোমা আছে নিশ্চয়—

অরুণ ঘাড়ে নাড়ে: উঁহু, খেয়াল হয়নি। চাকরি দিন, বছরের মধ্যে ডিপ্লোমা এনে দেবো। নয়তো তাড়িয়ে দেবেন।

সম্পাদক বললেন, আইন বেয়াড়া। নিয়ে তারপরে তাড়িয়ে দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তার থেকে বছর পরে ডিপ্লোমা নিয়েই আসবেন। আসবেন এ ঘরে নয়, তেতলায় ম্যানেজিং-ডিরেকটরের ঘরে। এসব চাকরি আমাদের হাতে নয়।

অধীর কণ্ঠে অরুণেন্দু বলে, আপনাদের হাতে যা আছে তাই দিন দয়া করে। সবুর সইছে না।

ফোর্থ ডিভিসনের লোকজন দায়ে-দরকারে আমরা নিয়ে থাকি—

প্রশান্ত ব্যাখ্যা করে দেয়: মানে পিওন দারোয়ান বেয়ারা ঝাড়ুদার এইসব আর কি! আপনারা যা পারবেন না।

অরুণ বলে, তা-ও তো কেউ দিয়ে দেখল না। পারি না-পারি— পরখ হোক। কোট ছেড়ে ফেলব, তলার ছেঁড়া-সার্ট বেরিয়ে থাকবে। ট্রাউজার বদলে খাঁকির হাফপ্যাণ্ট পরে আসব। পনেরটা মিনিট শুধু সময় দেবেন আমায়।

সুব্রতার চোখ ছলছলিয়ে এলো। অরুণের হাত ধরে টেনে বলে,

ঢের হয়েছে। চলে আয়।

সম্পাদকীয় দলটাকে নমস্কার করে বলল, বেকারি নিয়ে কড়া কড়া এডিটোরিয়াল লিখতে থাকুন আপনারা। জার্নালিজম সারা করে এক বছর পরেই তবে আসা যাবে।

রাস্তায় নেমে গম্ভীর চুপচাপ কয়েক মিনিট। তার পর জোর দিয়ে সুব্রতা বলল, ঘাবড়াসনে। আমি নেমেছি রণাঙ্গণে—চাকরি না হয়ে যায় কোথায় দেখি।

কী ভাবল একটুখানি। বলে, আয়—

কিছুদূর গিয়ে অরুণ বেঁকে দাঁড়াল: বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিস? আমি যাবো না। বেকার আছি তা বলে ফৌজদারি আসামি নই—জেরার তালে কেন যেতে যাব? বরঞ্চ যা বেলা আছে, আরও এক-আধটা অফিস ঘুরতে পারব।

বাড়িতে কেন নিয়ে যাব? ফিক করে সুব্রতা হাসল: গেলেও বিপদ ছিল না। জেরা আমার উপর দিয়ে বিস্তর হয়ে গেছে। সোজা বলে দিলাম, দেখতেই সুন্দর। বোকাসোকা মানুষ, কথাবার্তা কিছু ঝাল-ঝাল। একটা ক্ষমতাই আছে শুধু—দেদার পরীক্ষা পাশ করতে পারে। আর কোন কাজের নয়। তখন মা খপ করে আমার হাত এঁটে ধরে গায়ের উপর রাখল: গা ছুঁয়ে দিব্যি কর, ওর সঙ্গে মিশবিনে আর কখনো। বলতে হল, মিশবো না।

অরুণ বলে, ছি-ছি, মায়ের গা ছুঁয়ে বললি—তার পরেও মেশামেশি। তোর পাপের অন্ত নেই।

সুব্রতা হেসে বলল, চালাকি করেছিলাম রে। তড়বড় করে শেষের 'না' চেপে দিলাম, 'মিশবো না' না বলে 'মিশবো' বলে রেখেছি। মহাগুরু ছুঁয়ে দিব্যি গেলেছি 'মিশবো', না মিশে এখন করি কি বল্।

বাড়ির কাছাকাছি এসে বলে, মোড়ে গিয়ে দাঁড়া অরুণ, একটু

সাজগোজ করে আসি। এক্ষুনি এসে যাব, দেরি হবে না।

অরুণেন্দু বলে, আবার কি সাজ করবি রে, বেশ তো আছিস।

নিজ দেহের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে সুব্রতা বলল, না—নেই। থাকলে বলব কেন ?

অতএব মোড়ের উপর অরুণ গাড়ি-মানুষ নিরীক্ষণ করছে। সামনে মেয়ে-কলেজ। একটা ক্লাস শেষ হয়েছে, গাদা গাদা মেয়ে বাইরে। ট্রাম-বাসের জন্য অপেক্ষা করছে, কতক বা গুলতানি করছে গুচ্ছ গুচ্ছ দাঁড়িয়ে। হেন অবস্থায় এই স্থলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা দৃষ্টিকটু। বিপজ্জনকও বটে। মেয়েদের কিছু কিছু সম্ভবত নিজ-মূর্তি আয়নায় দেখে না, রূপলাবণ্য নিয়ে বিষম দেমাক তাদের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষটা নিখরচায় তাদের রূপসুধা পান করছে, এইরূপ সন্দেহে গোটা দুই এগিয়ে এলো।

এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?

অরুণেন্দু চটে গেল : ইচ্ছে হয়েছে। পাবলিক-রাস্তায় দাঁড়াব, তার জবাবদিহি কিসের ?

আর মস্তানগুলো কোন রেলিং-এর ধারে কোন রোয়াকের উপর কোন গাছের তলায় বেমালুম হয়ে থাকে—ঠিক সময়টিতে যেন মন্ত্রবলে টের পায়। ধেয়ে আসছে। বিপন্ন অরুণ মনে মনে সুব্রতাকে গালিগালাজ করে : অত জাঁকালো কাপড়চোপড় পরনে—তাতেও পোষালো না। নতুন করে সাজ হচ্ছে। হচ্ছে তো হচ্ছেই—এতক্ষণ কিসে লাগে বুঝিনে। নাঃ, মেয়েলোক নড়ানোর চেয়ে হিমালয়পর্বত নড়ানো অনেক সহজ।

কী হল, কী হল—করতে করতে গুটি পাঁচ-সাত চ্যাংড়া মধ্যবর্তী হল : আমাদের পাড়ার কলেজ, আমাদের পাড়ার মেয়ে—আপনি নজর দেবার কে ?

দিই নি নজর। দু-চক্ষু বুঁজে ছিলাম, ঠাহর পান নি। একচেটিয়া নজর আপনারাই দিন গে। মেয়ে-কলেজ আমাদের পাড়াতেও আছে—নজর দিতে বাস-খরচা করে এদ্দুর আসতে যাব কেন ?

যুক্তিতে কুলায় না, বচসা ক্রমেই খরতর হচ্ছে। হেনকালে সুব্রতার আবির্ভাব।

অরুণ বলে, বুঝলেন এবার—কেন দাঁড়িয়ে ছিলাম?

অনুযোগের সুরে সুব্রতাকে বলে, এইখানটা দেখিয়ে গেলি—দাঁড়ানোই তো গব্বো-যন্ত্রণা। ফড়িংয়ের মতন সামনের উপর এতগুলো তিড়িং মিড়িং করছে—চোখ বুঁজে অন্ধ হয়ে দাঁড়াতে হল। তা সত্ত্বেও ছোঁড়াদের হাতে ঠ্যাঙানি খাওয়ার গতিক। জায়গা ছেড়ে সরতেও পারিনে, হড়্‌ড হড়্‌ড করে কোথায় তুই খুঁজে বেড়াবি।

পাড়ার মেয়ে সুব্রতা—ডানপিটে মেয়ে, সুনাম আছে। ছোঁড়াগুলো তক্ষুনি কেটে পড়ল।

অরুণ বলছে, কুইন এলিজাবেথেরও সাজ করতে এত সময় লাগে না।

সুব্রতা বলে, রানীর চেয়ে অনেক কঠিন সাজ আমার। মানানসই শাড়ি একটা খুঁজে পাইনে। সাজগোজ যা-হোক এক রকম সারা হল তো বেরুনোর ফাঁক খুঁজছি। সদর পথে হবে না, বাবার চোখে পড়ে যাব। কানাগলির দুয়োর খুলে বেরুব—তক্কে তক্কে আছি, ঝি-চাকর কেউ দেখতে পেলে শতেক কথার তলে পড়ব: এদিকে কেন দিদিমণি, গলিতে কী তোমার? সাতচোরের একচোর হয়ে গুঁড়ি মেরে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এসেছি।

সাজ অপরূপ বটে। আধ-ময়লা অতিসাধারণ শাড়ি পরনে, শাড়ির সঙ্গে মানান করে হাতাওয়ালা জামা। এলোচুল, মুখে প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই। এমন কি, স্ট্র্যাপে তালি-দেওয়া স্যাণ্ডেল কোথা থেকে জোগাড় করেছে, সেই বস্তু পরে ফটফট আওয়াজে পা ফেলছে।

আপাদমস্তক দেখে নিয়ে অরুণ হেসে বলল, এ সাজ কেন রে? আগেই তো বেশ ভাল ছিল।

ছিল না। কাগজের অফিসে ঢুকেই বুঝতে পারলাম। অস্বস্তি লাগছিল, তখন আর বেরিয়ে আসি কেমন করে?

অরুণ বলে, উমেদার তুই তো নোস—

সুব্রতা বলে যাচ্ছে, তখন ঢুকে পড়েছিলাম সচ্ছল বাড়ির এক শৌখিন মেয়ে। এবারে হয়ে যাচ্ছি এক উমেদারের—

উমেদারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক বলবে, জিনিসটা চেপে গেল। হরিবিলাসবাবুর কাছে কী ভাবে আরম্ভ করবে, কথাগুলো কী হবে— সুব্রতা আদ্যোপান্ত মনে মনে মকসো করতে করতে যাচ্ছে।

হরিবিলাস ব্যস্ত মানুষ। দরজায় বোর্ড ঝুলানো: নো ভেকেন্সি। লেখাটা সুব্রতা আঙুলে দেখিয়ে হতাশ ভাবে বলল, যা চ্চলে।

বহুদর্শী অরুণ হেসে জ্ঞান দান করে: তার মানে ঠিক জায়গায় এসে গেছি। খোঁজ নিয়ে দেখ্, চেম্বারের সামনে বারো-মাস তিরিশ-দিন বছরের পর বছর ধরে কায়েমি ভাবে এ জিনিস ঝুলছে। বলতে চাস, চাকরি এদের কস্মিন কালে খালি হয় না—মরণশীল মানুষ এদের কেরানি হয়েই মৃত্যু বিজয় করে ফেলে?

তবে?

চাকরি দেওয়ার হর্তাকর্তা আমি, বোর্ড ঝুলিয়ে সেইটে জানান দিচ্ছে। গূঢ় অর্থটা এই। ঝানু উমেদারে এক নজরে বুঝে নেয়। বেদবাক্য বলে অক্ষরে অক্ষরে মানতে গেছিস কি মরলি।

তবে মানব না—

বলে সুব্রতা সুইং-দরজার দিকে ধেয়ে গেল। বেয়ারা বাধা দিয়ে বলে, স্লিপ দিন আগে।

স্লিপের প্যাড ও পেন্সিল রয়েছে, নাম আর প্রয়োজন লিখে ভিতরে পাঠাতে হয়। সুব্রতা বলে, পরিচয় পেলে কি আর ঢুকতে দেবে?

কিন্তু বিনি হুকুমে ঢুকবেন কি করে?

এই তো ঢুকছি—

দরজা ঠেলে সুড়ুত করে টেবিলের ধারে দাঁড়াল। হরিবিলাস

ঘোরতর ব্যস্ত, ফাইলে ডুবে আছেন। কাল সকালে ডিরেকটর-বোর্ডের মীটিং, তার জন্য তৈরি হচ্ছেন।

মুখ তুলে ভ্রূকুটি করলেন: কী চাই?

তীক্ষ্ণ চোখে হরিবিলাস সুব্রতার দিকে বার কয়েক তাকালেন: দরজার উপর বোর্ড ঝুলছে—দেখে আসেন নি?

সুব্রতা সকাতরে বলে, আমি আপনার মেয়ের মতো। 'আপনি' 'আপনি' করছেন কেন, দুঃখ লাগে।

বেশ হল তাই। চাকরি খালি নেই, কেন ঝামেলা করতে এসেছ?

সব দরজায় এমনি লটকানো। ঢুকতে মানা। কিন্তু পেট মানে না যে।

পেটের ভাবনা খুব বুঝি তোমার?

মৃদু হাস্য খেলে যায় প্রবীণ অফিসারের মুখে: স্বাধীন-জেনানা হয়েছ—বাপের অন্ন খাবে না?

আমতা-আমতা করে সুব্রতা বলে, আমার জন্যে ঠিক নয়—

ও, পরোপকার। না, তোমায় দালাল ধরেছে—কমিশন পাবে। দেখ, চাকরিবাকরি বকলমে হয় না—নিজের আসতে হয়।

এসেছে বই কি! কিন্তু মেয়েছেলের সুবিধা পুরুষে পায় না তো—আমি ঢুকে গেছি, ও আটক হয়ে বাইরে পড়ে আছে।

এত সময় হরিবিলাস কাউকে দেন না। তার উপব বোর্ডের মিটিংয়ের ব্যাপারে আজ বেশি রকম ব্যস্ত। সুব্রতা দ্রুত দরজা খুলে হাত ধরে অরুণেন্দুকে নিয়ে এলো। হরিবিলাস চাচ্ছিলেনও ঠিক এই।

অরুণেন্দুকে দেখে নিয়ে গম্ভীর অভিভাবকীয় কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন: ছেলেটি কে হয় তোমার?

সুব্রতা আগেই ভেবে রেখেছে। বেশি জোরদার হবে, তাই বলে দিল, স্বামী—

সশব্দে হরিবিলাস চেয়ারটা অরুণেন্দুর দিকে ঘোরালেন: এর বাপ ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার। মেয়েটা ভেবেছিল চিনতে পারি নি—

ওন্ড ফুল আমরা কিনা ওদের কাছে। তা বেশ হয়েছে—তুমি তো জামাই আমার। চাকরি নিশ্চয় দেবো—কিন্তু হুট করে তো হয় না, দু-চারদিন দেরি হবে। কোন কাজ পারবে তুমি ?

যা দেবেন—

কী কতগুলো কাগজে সই করাতে এক ছোকরা কর্মচারী এই সময়ে ঢুকল। হরিবিলাস তাকে বললেন, রুদ্র, তোমার টেবিলে নিয়ে গিয়ে ছেলেটির সঙ্গে কথাবার্তা বলো। নোট করে রাখো, তারপর আমায় দেবে সমস্ত। পরের ভেকেন্সিতে ছেলেটিকে ডাকব।

রুদ্র নিজ টেবিলে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে : নানান ডিপার্টমেণ্ট আমাদের—কোন্ কাজে সুবিধা হবে ?

অরুণ বলে, যা দেবেন—

ব্যঙ্গস্বরে রুদ্র বলল, যদি ম্যানেজার করে দেয়—পারবেন ?

পারব।

উমেদার নিয়ে মজা করা—এ জিনিসে অরুণের অঢেল অভিজ্ঞতা। একটা মিনমিনে ভাব ছিল গোড়ার দিকে, হেঁ-হেঁ করত—সেসব এখন কেটে গেছে। স্তোক দিয়ে তাড়াচ্ছ তো সে-ই বা কম যাবে কেন, সমান সুরে জবাব দেয় : ম্যানেজার করলে পারব, ম্যানেজারের বেয়ারা যদি করেন তা-ও পারব।

কোয়ালিফিকেশন কী আপনার ?

একটা দুটো নয়, কাঁহাতক ফিরিস্তি দিয়ে যাই। কোন্ কোন্ চাকরি আপনার আন্দাজে আছে তাই বলুন, জবাবের সুবিধা হবে।

কৌতুককণ্ঠে রুদ্র বলছে, ধরুন ল-অফিসার। আইনের ডিগ্রি চাই।

হবে—

একাউন্টাণ্ট যদি হতে হয় ? কমার্সের ডিগ্রি তার জন্যে।

অরুণেন্দু নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে, তা-ই হবে।

আর স্টেনো যদি লাগে ?

হেসে উঠে অরুণেন্দু বলে, ডিগ্রি নয় ডিপ্লোমা নয়, একটুকু

সার্টিফিকেটের অভাবে সোনার চাকরি হাত-ছাড়া হতে দেবো নাকি?

বাব্বা, কত কি শিখে রেখেছেন!

অরুণেন্দু সগর্বে বলে, আরও তো জিজ্ঞাসা করলেন না। কাউন্টারে যদি বসাতে চান, সেলসম্যানশিপ পড়া আছে। টেলিগ্রাফির জন্য টরে-টক্কা শিখেছি। সোফার করবেন তো ড্রাইভিং লাইসেন্সও নিয়ে রেখেছি।

রুদ্র বলে, সবজান্তা যে আপনি।

হতে হয়েছে। বছরের পর বছর অবিরাম উমেদারি চালাচ্ছি। শুনি, অমুক ট্রেনিংটা যদি থাকত নিয়ে নিতে পারতাম। লেগে যাই তক্ষুনি। যেটা চাইবে, 'হাঁ' বলে যাতে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারি—খুঁত খুঁজে না পায়। হতে হতে এখন আবার উল্টো খুঁত বেরুচ্ছে। বলে, হবে না—ওভার-কোয়ালিফায়েড আপনি।

রুদ্র বলে, বড় খুঁত ওটা। না-জানা ঢের ঢের ভাল, অনেক-কিছু জানলে কাজকর্ম হয় না। এটা না ওটা—মন উড়ু-উড়ু করে কেবল। অফিসের টাইপ করতে বসে খবরের-কাগজ দেখে দেখে নিজের দরখাস্তই টাইপ করবেন কেবল।

অরুণেন্দু সুব্রতার দিকে চোখ টিপল: হয়ে গেল আজকের মতন। কাল এগারোটা থেকে আবার। চল্—

রুদ্র তাড়াতাড়ি বলে, নাম-ঠিকানা দিয়ে যান। স্যার লিখে নিতে বললেন। লেখা রইল, সময়ে খবর পাবেন।

অরুণ সহাস্যে বলে, পাবো না, তামা-তুলসি ছুঁয়ে দিব্যি গালতে পারি। নাম-ঠিকানা নিশ্চয় নেবেন। অফিস-পাড়ায় সব ঘরেই প্রায় আছে—আপনাদেরই বা বঞ্চিত করি কেন?

বেরুল দু-জনে পাশাপাশি।

অরুণ বলে, চালাকি করতে গিয়ে কী বেকুবটা হলি। বুড়ো চিনে ফেলল।

বেকুব মানে? হরিবিলাস-জেঠা অন্ধ নন, আমি বেশ ভাল রকম জানি। হঠাৎ যেন ধরা পড়ে গেছি, তেমনি একটা ঢং দেখালাম। জেঠা মানুষটা ঘুঘু, তাহলেও বিলকুল বিশ্বাস করে ফেললেন।

ঢোঁক গিলে নিয়ে সুব্রতা বলল, অবিশ্যি যে-কোন মেয়ে তোর সঙ্গে প্রেমে পড়ে যেতে পারে। আর প্রেমে পড়ে বিয়ে করাও অসম্ভব কিছু নয়।

চোখ পিটপিট করে অরুণ বলে, আশা করি তুই পড়িসনি।

তাই কি বলা যায়? প্রেমিক-প্রেমিকা গোড়ার দিকে তো একেবারে বুদ্ধু বনে যায়। কিছু-একটা হয়েছে বলে সন্দ করি। নয়তো দেশ জুড়ে এত বেকার থাকতে তোর জন্যে এমন ঘোরাঘুরি করি কেন?

এই মরেছে! হতাশভাবে অরুণেন্দু বলে উঠল।

সুব্রতা অভয় দেয়ঃ ঘাবড়াস কেন? অঙ্কে ফাস্টক্লাস অনার্স আমি, সেটা ভুলিসনে। প্রেম হোক আর যাই হোক, হিসেব ঠিক থাকে। ভালরকম রোজগার যদ্দিন না হচ্ছে, বিয়েথাওয়ার আশা করিসনে।

অরুণ বলে, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল রে বাবা। রোজগারপত্তর কোনদিনই হবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত। হয়ে দরকারও নেই, তুই তখন গছে পড়তে পারিস।

আবার বলে, চা খেয়ে নিইগে চল্। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, ঝগড়ায় জোর বাঁধছে না।

সুব্রতা বলে, বেশ তুই! দরজায় দরজায় এত ঝাঁটা-লাথি খেয়ে দিব্যি কেমন হাসতে পারিস।

ঝাঁটা-লাথি সত্যি সত্যি হলে দেহে লাগত, আপত্তি করতাম। মুখের কথা এ-কান দিয়ে ঢোকে, ও-কানে বেরোয়—মনে পৌঁছয় না। ঘোড়ার-ডিম মনই তো নেই—রগরগে মন একটা ভিতরে থাকলে উমেদারি করা চলে না।

খানিকটা হেঁটে চৌরঙ্গির একটা মাঝামাঝি রেস্তোরাঁয় ঢুকে গেল।

সুব্রতা বলে, কী খাবি বল্।

যা তুই খাওয়াবি। নিখরচায় বিষ পেলেও আপত্তি নেই। রাত্রে রুটি খাই, সেইটে যদি বাঁচাতে পারি অনেক মুনাফা।

খেতে খেতে অরুণ খপ করে জিজ্ঞাসা করল: একেবারে তুই ও-কথা বলে বসলি কেন?

কোন কথা?

আমায় জড়িয়ে সম্পর্ক বাড়াতে বাড়াতে একেবারে কোথায় নিয়ে তুললি?

বলেছি, বর তুই আমার—

সুব্রতা সহজভাবে বলে, এর আগে ক্লাসফ্রেণ্ড বলেছি বয়ফ্রেণ্ড বলেছি মামাতো-ভাই সহোদর-ভাই বলেছি—কাজ হচ্ছে না তো শেষটা বর। দেখি কয়েকটা দিন। এতেও যদি না হয় তো আর এক মতলব ভেবে রেখেছি।

কাটলেটে কামড় দেয় আর মিটিমিটি হাসে। বলে, বাচ্চা ভাড়া পাওয়া যায় শুনেছি। তাই একটা ঘাড়ে ফেলে তোর পিছনে নিয়ে অফিসে ঢুকে পড়ব: স্বামীকে এক্ষুনি একটা চাকরি দিন স্যার, বাচ্চার মুখে জল-বার্লিটুকুও দিতে পারছি নে। ভাল অভিনয় জানি আমি—এ-ও দেখিস বিশ্বাস করবে।

॥ আট ॥

'চাকরি দিন' 'চাকরি দিন'—এ রকম আন্দাজি বুলি না ছেড়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে 'অমুক চাকরিটা দিন—' বলে যদি চেপে ধরা যায়, তবে খানিকটা কাজ হতে পারে, মনে হয়। কিন্তু কর্মখালির খবর বের করার উপায়টা কি? খবর যখন কানে এসে পৌছয়, তার আগেই লোক বহাল হয়ে গেছে। কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন রীতিরক্ষার এক বস্তু, সর্বলোকে জানে।

শ্মশানে ঢুঁড়ে বেড়ালে কেমনটা হয়, কিছুদিন থেকে অরুণেন্দু ভাবছে।

স্ত্রী-পুরুষ যুবা-বৃদ্ধ খাটে চড়ে এসে এসে হাজির হন। বয়স ও চেহারা থেকে অনুমান করে চাকরিস্থলের খোঁজখবর নেওয়া যেতে পারে। শ্মশান-বন্ধুদের সঙ্গে খাতির জমাতে হবে, অবস্থা বিশেষে দু-দশ ফোঁটা অশ্রুপাতেরও আবশ্যক হতে পারে। আরও এক রাস্তা আছে—অহোরাত্রি অফিস সাজিয়ে যাঁরা মড়া রেজেস্ট্রির কাজে আছেন, তাঁদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ফেলা: চাকুরে মড়া বলে যদি ধরা পড়ে, নামধাম ও অফিসের নাম দয়া করে টুকে রাখবেন—আমি এসে এসে নিয়ে যাবো। নিরম্বু দয়ার বশে নিশ্চয়ই করবেন না, খরচা করতে হবে। তা হলেও ঝামেলা কম। গোরস্থানেও অনুরূপ ব্যবস্থা হতে পারে। উমেদারিতে হিন্দু-মুসলমান খৃস্টান-বৌদ্ধ নেই—কর্মটি রীতিমতো সেকুলার এ বাবদে।

খাতা লেখার ডিউটি শেষ করে এসে অরুণেন্দু দরখাস্ত লিখতে বসেছিল। বেশ একগাদা হয়েছে। সকালবেলা ডাকবাক্সে ফেলবে। এককালে দরখাস্তের সঙ্গে স্ট্যাম্প পাঠাত জবাবের প্রত্যাশায়। বহুদিন বন্ধ করে দিয়েছে। তৎসত্ত্বেও খরচা প্রচুর—ডাকটিকিটের

খরচা খাইখরচা ছাড়িয়ে গেছে। কিছু দরখাস্ত ইদানীং বিনাটিকিটে বেয়ারিং-পোস্টে ছাড়ছে। অনবধানতায় ভুল হয়ে গেছে—এই আর কি! বড় বড় কোম্পানি ওরা—কয়েকটা পয়সা দিয়ে নিয়ে নেবে ঠিক। না নিলেই বা করছি কি!

দরখাস্তগুলো খামে এঁটে ঠিকানা লিখে একত্র বেঁধে রাখল। সন্ধ্যা থেকে লেখা চলছে—আঙুল টনটন করছে বড্ড। রাত্রের রুটি চাঁদ-কেবিনেই বানিয়ে দেয়। রুটি ক'খানা খেয়ে পিছন-কামরায় এসে নিঃশব্দে অরুণ শুয়ে পড়ল। ঘুম আসে না, নানান চিন্তা। এত করেও কিছু হচ্ছে না, কোনদিকে আলোর কণিকা দেখা যায় না—মানসপটে তখন ঐ শ্মশানঘাট গোরস্থান ইত্যাদি কৌশল ভেসে আসছে। দাদা পূর্ণেন্দুর মৃত্যুর সঙ্গে নিত্যিদিনের লুকোচুরি খেলা—উপজীবিকা তার ওই। দাদাই এতাবৎ জিতে আসছে, কিন্তু কোনো এক ক্ষণে তিলেক অসাবধানে পেলে মৃত্যুও ছেড়ে কথা কইবে না। যশোদার কথা ভাবে—শয্যাশায়ী পঙ্গু অবস্থায় মা-জননী সম্ভবত কান পেতে আছেন, কনিষ্ঠপুত্র সম্রাট হয়ে লোকলস্কর সহ মহা ধুমধামে উঠানে এসে পড়েছে। এবং বউদি মলিনারও আশাভঙ্গের কারণ নেই—সম্রাটের তাঞ্জামের পিছনদিকে ঐ যে চতুর্দোলা। মাথায় মুকুট ঝলমলে সাজসজ্জায় সুব্রতাই বুঝি রাজরানী সেজে তালপাতার কুঁড়েঘরের ছাঁচতলায় এসে নামল। ওরে বাজনা বাজা, উলু দে। পাথরের থালায় দুধে-আলতায় গুলে তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়—নতুন-বউ নেমে তার মধ্যে পা ডুবিয়ে দাঁড়াবে।

স্বপ্ন দেখতে দোষ কি—নিখরচার বস্তু, দেদার দেখে যাও। জীবনে না আসুক, স্বপ্নেই এসে যাক না খানিকক্ষণের জন্য। ধরো, ব্যবস্থা এমনি হয়ে গেছে—পড়াশুনো শেষ হতে না হতে তোমার নামে এই মোটা এক সরকারি চিঠি—এক ডজন চাকরির লিস্টি যাবতীয় বিবরণ সহ। বেছে নাও যেটা তোমার পছন্দ। নেবোই না, যদি বলো: না স্যার, কাজকর্মে আমার রুচি নেই, বাড়ি বসে বসে ঘুমুব, এবং তাসপাশা খেলব—পুলিশ পাঠিয়ে ধরে নিয়ে

সরকার তোমায় কাজে জুতে দেবে। দেশের ছেলে তুমি—তোমার জ্ঞান-বিদ্যা-শ্রমশক্তি সরকার নৈষ্কর্মে নষ্ট হতে দেবে না। দেশেরই লোকসান তাতে। শিক্ষার দায় সরকারের, আবার সেই অর্জিত শিক্ষা বিফলে না যায় সেই অপব্যয় নিরোধের দায়ও সরকার কাঁধে তুলে নিয়েছে। ব্যাপারটা নিতান্তই কল্পনা-বিলাস কিন্তু নয়। আছে এইরকম জিনিস—আছে, আছে। প্রাগ থেকে ছেলেমেয়ের একটা দল এসেছিল—একজনে বলছিল পড়াশুনো শেষ হতেই চাকরির লিস্টি চলে এলো, চাকরিও পছন্দ করে ফেলেছি। তিন মাসের ছুটি দিয়েছে—কষ্ট করে ইস্কুল-কলেজ ঠেঙালে এদ্দিন, কর্মচক্রে সেঁদিয়ে পড়বার আগে ফুর্তিফার্তি করে নাও মাঝের এই তিনটে মাস। এদেশ-সেদেশ তাই একটু চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছি। বিদেশি ছেলেটার উক্তিগুলো কি ডাহা-মিথ্যে বলে ধরব?

হরিমোহনের কাছে অরুণেন্দু ও সুব্রতা যুগলে দরবার করে গেল। তারই কয়েকটা দিন পরে এক পার্টিতে জগন্নাথের সঙ্গে দেখা। হরিমোহন অনুযোগ করলেন: আপনার জামাই দেখলাম। পছন্দসই জামাই বটে—দেখতে খাসা, কথাবার্তাও চমৎকার। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, আমরা একটু জানতে পারলাম না!

আমার জামাই?

জগন্নাথ আকাশ থেকে পড়লেন।

আপনার মেয়ে সুব্রতা আমার কাছে নিয়ে গিয়েছিল চাকরির জন্য।

স্তম্ভিত জগন্নাথ। কথাবার্তা বলে সহজ হতে গেলেন, কথা বেরুল না।

হরিমোহন বললেন, চাকরি তো আর হাতে মজুত থাকে না—বলে দিলাম সেইকথা মা-জননীকে। ওরা আমায় বড্ড দায়ের মধ্যে ফেলেছে। নতুন-জামাই আবদার ধরেছে, তার উপরে আছে সুব্রতা

মায়ের সুপারিশ। যেভাবে হোক, ব্যবস্থা কিছু করতেই হবে। নাম লিখে নিয়েছি।

এর পরে জগন্নাথ যতক্ষণ পার্টিতে ছিলেন, হরিমোহনের পাশ কাটিয়ে বেড়ান। কারো সামনে জামাইয়ের প্রসঙ্গ উঠে না পড়ে। এই মেয়ে হতে হাড়ে-দুর্বাঘাস গজাবে, দেখা যাচ্ছে।

বাড়ি এসে সুব্রতাকে ডেকে ঘরের দরজা এঁটে দিলেন : বিয়ে করেছিস?

সুব্রতা বলে, তবু ভালো! তোমার চোখ-মুখ দেখে আর তোমার দরজা দেবার ঘটা দেখে ভাবলাম, বুঝি খুনখারাবি করে এসেছি কোথাও।

জগন্নাথ বলেন, বাজে কথা রাখ্। বিয়ে করে বসেছিস কিনা, খুলে বল।

তা হলে কি টের পেতে না তোমরা?

না, পেতে দিসনে তোরা আজকাল—

জগন্নাথ খিঁচিয়ে উঠলেন মেয়ের উপর : বিদ্বেবতী স্বাধীন-জেনানা হয়েছিস—নিজের গার্জেন নিজে। রেজেস্ট্রি-অফিসে কাজকর্ম সম্পূর্ণ সেরে তারপরে সুবিধা মতন একদিন জামাই নিয়ে হাজির দিবি : বাবা, এই দেখ তোমার জামাই—

সুব্রতা বলে, মিছামিছি গাল দিচ্ছ বাবা। আমি যেন করেছি সেইরকম!

করেছিস বইকি! আমার কাছে না হোক, অন্যের কাছে ঠিক এই জিনিস করেছিস। হরিমোহনদা'র কাছে নিয়ে গিয়েছিলি।

তাই তুমি অমনি বিশ্বাস করে বসলে?

তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে জগন্নাথ বললেন, কী বলতে চাস, হরিমোহনদা মিছে কথা বললেন আমার সঙ্গে?

অম্লানবদনে হতভাগা মেয়ে বলল, মিছে কথা আমিই বলেছি

হরিমোহন জেঠার সঙ্গে। বড্ড গরিব বাবা, ডেকে পাঠিয়ে তার নিজের মুখে একদিন না-হয় শোন। ছোট্ট একটা ঘরে জন পাঁচ-সাত গাদাগাদি হয়ে পড়ে থাকে, কোনদিন খায় কোনদিন খায় না। এমন মানুষ তোমার জামাই হবে কেমন করে?

তবে বলে বেড়াচ্ছিস কেন?

পরোপকার। আরও অনেক রকম বলে দেখেছি, কিছুতে কাজ দিল না। শেষটা এই মোক্ষম সম্বন্ধ বলতে লেগেছি।

পাগল না কী তুই! খবরদার, বলবিনে এমন। সোমত্ত মেয়ে নিজ-মুখে এইসব বলে বেড়াচ্ছিস—বিয়ে হবে কোনো কালে?

সুব্রতা আবদারের ভঙ্গিতে বলে, তবে তুমিই একটা চাকরি দাও বাবা। কাউকে কিছু বলতে যাবো না।

জগন্নাথ রেগে উঠলেন: চাকরি আমি গড়াব নাকি?

তবে কিছু বলতে পারবে না। কথা দিয়েছি, চাকরি আমি দেবোই জুটিয়ে। চেষ্টা আমি সর্বরকমে করব, কথার খেলাপ হতে দেবো না।

মেয়ের জেদ দেখে জগন্নাথ নরম হলেন: ছেলেটা কে তোর শুনি?

ক্লাসফ্রেণ্ড। প্রেসিডেন্সিতে একসঙ্গে পড়েছি।

পড়েছিস আরও তো কতজনের সঙ্গে। গণতিতে এক-শ দু-শ হবে।

সুব্রতা বলে, বছরের পর বছর বেকার হয়ে ঘুরছে। কত চেষ্টা করল, কিছুতে কিছু হয় না।

জগন্নাথ বললেন, এ রকম লক্ষ বেকার কলকাতা শহরে।

অরুণবাবুর চাকরি হলে লাখ থেকে একটা তবু কমবে।

সকাতরে বলে, কথা দিয়ে বসেছি—ওর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে আমারও তো পায়ে ব্যথা হয়ে গেল। দাও বাবা কিছু জুটিয়ে—কোনরকমে সংসার চলবার মতো হলেই হবে।

সংসারের পরিচয় নিচ্ছেন জগন্নাথ: কে কে আছেন ছেলেটার?

আমি তা কী করে জানব? মা আছেন শুনেছি। মায়ের উপর বড্ড টান, মায়ের নামে পাগল হয়ে ওঠে। মায়ের জন্য কিছু করতে পারল না, সেই জন্য বেশি ছটফটানি। দাদাও আছেন বটে—একবার এসে ধরে পেড়ে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন।

বলতে বলতে সুব্রতা থেমে গেল। ফিক করে হেসে আবার বলে, এত খবর কেন নিচ্ছ বাবা, জামাই সত্যি সত্যি করতে চাও? চেহারা দেখলে সেইরকম ইচ্ছে হবে—দেখ একবার, তারপরে বোলো।

একটু থেমে মিটিমিটি হেসে বলল, চেহারা দিয়ে তো পেট ভরবে না, আসলে আটকাচ্ছে। তোমার জামাই হলে তো অফিসার হতে হবে আগে। আর নয়তো কালোবাজারের ফড়ে। তোমার মেয়ে যাতে আরামের মধ্যে গা ভাসিয়ে সাঁতরাতে পারে। অত হ্যাঙ্গামে কাজ নেই বাবা, যেমন-তেমন একটা চাকরি জুটিয়ে দাও তুমি—আমার কথা রক্ষে হয়ে যাক। চাকরি হয়ে গেলে আর কোন সম্পর্ক নেই—মিথ্যে পরিচয় দিয়ে লোকের দয়া কুড়োতে যাব না। কী দরকার!

জগন্নাথ কূল দেখতে পেলেন: সত্যি বলছিস?

দিয়ে দেখ। স্বামী-টামি কিচ্ছু বলব না। তাই বা কেন—মোটে কথাই বলব না তখন। শতেক হাত দূরে দূরে থাকব। দেখো তুমি।

মেয়ের কাঁধ থেকে ভূত নামানোর দরকার। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়। নয় তো বিয়ে দেওয়া দুর্ঘট হবে। লোকের কাছে নিজেরাও মুখ দেখাতে পারবেন না। বিস্তর কলকৌশল খাটিয়ে মাস তিনেকের ভিতর জগন্নাথ চাকরি জুটিয়ে দিলেন—তাঁর নিজের অফিসে।

চাকরি এলো তবে সত্যি সত্যি—অরুণেন্দুর মুঠোয় স্বর্গ। কলম মুঠোয় ধরে প্রতিদিন দশটা-পাঁচটা পেষণ করে যাও। জীবনতরী

তর তর করে চলল এবার—আবার কি! মৃত্যুর ঘাট অবধি পৌঁছে দিয়ে ছুটি। যেমন-তেমন চাকরি দুধ-ভাত, যশোদা বলে থাকেন। শাক-ভাতের বদলে এবারে মা দুধ আর ভাত মনের সুখে খাবে।

জগন্নাথ অরুণকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন, এই তিন মাস তোমার জন্যে যা করেছি, সে আমি জানি আর ঈশ্বর জানেন। চাকরি শুধু চেষ্টা করে হয় না, ভাগ্যেরও দরকার। ভাগ্য তোমার হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে গেল, হারাণবাবু অসুখে পড়লেন। কষে আমি নোট দিতে লাগলাম, ক্লার্ক ছাড়া একদিনও চালাতে পারব না। জানাশোনা একটি ভালো ছেলে আছে। তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবার দায়িত্ব নিচ্ছি। চাকরি আপাতত টেম্পোরারি, কিন্তু সেটা কিছু নয়—

গলা নিচু করে বললেন, অসুখ সাংঘাতিক। যমের দোসর—ক্যানসার। নির্ঘাৎ টেঁসে যাবেন। ও কালব্যাধি থেকে কেউ ফেরে না। কথাটা যেন ছড়িয়ে না যায়—ডাক্তারের কড়া নিষেধ। রোগির কানে গেলে দশটা দিনও আর বাঁচবেন না।

এদিকেও জগন্নাথ তিলার্ধ নিশ্চিন্ত নেই। মেয়ের বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। সুব্রতাকে স্মরণ করিয়ে দেন: আমার কথা আমি রেখেছি। তোর কথারও নড়াচড়া না হয় যেন।

সুব্রতা বলে, আনো সম্বন্ধ। আমি কি আপত্তি করছি?

মাসের মাইনে হাতে এসে গেল। সত্যি-চাকরির টাকা—দাদা সেই যে চাকরে-ভাই সাজিয়ে বাড়ি নিয়ে গিয়ে মা বউদি এবং পাড়াসুদ্ধ মানুষকে ভাঁওতা দিয়েছিল, সে জিনিস নয়। এবারে বাড়ি যাওয়া যেতে পারে—বিজয়ীর মতন মাথা উঁচু করে যাবে। আচার্যবাড়ির আতঙ্ক—ছেলে গছানোর জন্য তাঁরা মুকিয়ে রয়েছেন। ছোট্টুর জন্য সত্যিই এবারে চেষ্টাচরিত্র করবে, এবং হয়েও যাবে মনে হয়। যেহেতু বিদ্যের গন্ধমাত্র তার গায়ে নেই—নিরেট নির্ভেজাল

মূর্খমানুষ।

সকলের বড় কাজ, রেল থেকে সরিয়ে এক্ষুনি দাদাকে বাড়ি এনে বসানো। রাস্তার ধারে একটা চালা তুলে দোকান দিয়ে দেবে, তেল-নুন-কেরোসিন বিক্রি করে যা দু-চার টাকা আসে। আর মাসের পয়লা হপ্তায় অরুণ তো নিয়মমতো টাকা পাঠিয়েই যাচ্ছে। কখনো তাতে ভুল হবে না। সংসার দিব্যি চলবে—দাদার ব্যবস্থাটা এইবার সকলের আগে।

জগন্নাথকে বলে রবিবারের সঙ্গে সোমবারটাও ছুটি করে নিয়েছে। বাড়ি যাবে। শনিবার অফিস থেকে সোজা বেরিয়ে পড়বে। বাড়িতে ইদানীং সে চিঠিপত্র লিখত না—বানিয়ে বানিয়ে কত মিথ্যে আর লেখা যায়! বাড়ির চিঠিও পাঁচ-দশখানা এসে বন্ধ হয়ে গেছে। মা রেগে আছেন—চাকরিবাকরি নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে, বাড়ির সকলের কথা ভুলে গেছে, এই রকম ধারণা। দুম করে আচমকা গিয়ে পড়ে মায়ের রাগ ভাঙাবে: মাগো, অনেক ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে এতদিনে বুঝি কূল পেলাম। কূল পেয়েই আমি বাড়ি ছুটেছি।

কিন্তু তার আগেই মায়ের চিঠি। চিঠি সর্বনেশে খবর এনে হাজির করল। আঁকাবাঁকা অক্ষর, কাটাকুটি ও বানান-ভুলে ভরা—মায়ের জবানি বউদি চিঠি লিখে দিয়েছে: সাংঘাতিক বিপদ, পূর্ণর খোঁজখবর নেই, যে অবস্থায় থাকো বাড়ি চলে এসো।

গিয়ে পড়ল অরুণ। পূর্ণেন্দুর খবর ইতিমধ্যে মিলে গেছে। যে শঙ্কা করা গিয়েছিল তত দূর নয়—প্রাণে বেঁচে আছে সে। পাকিস্তান এলাকার মধ্যে ধরা পড়েছে। দলের অনেকগুলোকে ধরেছে—চরবৃত্তি করে বেড়ায়, এই নাকি সন্দেহ। হাজতে নিয়ে রেখেছে, মামলা হবে। এক ছোকরা কোন রকমে পালিয়ে এসে খবরটা দিল।

মা হাউ-হাউ করে কাঁদেন। কোণের দিকে ঘোমটা টেনে বউদি

ঘাড় হেঁট করে একমনে মেয়ের কাঁথা সেলাই করছে।

অরুণ উচ্চকণ্ঠে প্রবোধ দিচ্ছে: মাকড় মারলে ধোকড় হয়, তোমরাও যেমন! চরবৃত্তি প্রমাণ করা অত সহজ নয়। আমাদেরও ডেপুটি হাই-কমিশনার মস্তবড় অফিস সাজিয়ে ঢাকায় বসে আছে। ভারতের প্রজার উপর অন্যায় জুলুম না হয়, তাই দেখা কাজ তাদের। বড় বড় উকিল-ব্যারিস্টার লাগাবে, ড্যাং-ড্যাং করে বেরিয়ে আসবে দাদা দেখো। ছ্যাঁচড়া কাজে আর যেতে দিও না মা।

নতুন চাকরি, কামাই করা চলে না। বুঝিয়েসুজিয়ে খরচখরচার টাকা যতদূর পারে মায়ের হাতে গুঁজে দিয়ে অরুণেন্দু কলকাতা ফিরল।

অরুণেন্দু অফিস থেকে ফিরছে। সুব্রতারা দোকানে কেনাকাটা করছিল। দেখতে পেয়ে সুব্রতা বেরিয়ে এলো।

সুসংবাদ দিল: আমার বিয়ে।

চোখ বড় বড় করে অরুণেন্দু বলে, বলিস কি! বড্ড যে তাড়াতাড়ি—

বর রণদা রায়। প্রেসিডেন্সিতে আমাদের এক বছরের সিনিয়র। দেখে থাকতে পারিস আমার সঙ্গে। পড়ায় ইস্তফা দিয়ে বাঙ্গালোরে মেসোর রেয়ন-ফ্যাকটরিতে ঢুকে গেল। বুদ্ধির কাজ করেছিল, মস্ত লোক সে এখন।

অরুণ বলে, আমি কেস করতে পারি জানিস! তামাম অফিসপাড়া সাক্ষি মানব—আমার সঙ্গে কোন্ সম্পর্ক নিজমুখে তুই পরিচয় দিয়ে বেড়িয়েছিস।

ঐ ভয়েই বাবা অতদূর নির্বাসন দিচ্ছেন—সে কি আর বুঝিনে! কলকাতায় বরের দুর্ভিক্ষ হয় নি যে বরের তল্লাসে বাঙ্গালোরে দৌড়তে হবে। এখানে বিয়ে দিতে ভরসা পান না, অফিসপাড়ার কাহিনী পাছে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে যায়।

অরুণেন্দু বলে, বিয়ে না-ই হল—বিয়ের নেমন্তন্নটা যেন পাই দেখিস।

তা বলতে পারিনে—

সুব্রতার সাফ জবাবঃ বাদই পড়বি, ধরে রাখ্। বাবার বাড়িতে বাবার নিজের বন্দোবস্ত—আমি কী করতে পারি বল্। তোকে নেমন্তন্নে ডেকে বিপদও ঘটে যেতে পারে। বিয়ে হবে শুনেই মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আর চোখের উপর দিয়ে অন্য লোকের বউ হয়ে যাচ্ছি—হতাশপ্রেমিক তখন ছোরা বের করে আমার বুকে দিলি বা খ্যাচ করে বসিয়ে। অথবা নিজের বুকে।

মিটিমিটি হেসে বলল, রাজি থাকিস তো বল্। সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে তোর সঙ্গে পিঠটান দিই। আছে সাহস?

অরুণেন্দু রাজি নয়ঃ তা কেমন করে হবে, চাকরি চলে যাবে যে! আমার অনেক কষ্টের চাকরি।

সুব্রতা হাত নেড়ে বলে, যাক না। আমায় তো পেয়ে যাচ্ছিস।

তুই তো তুই—একখানা সসাগরা ধরিত্রী পেলেও চাকরি ছাড়তে রাজি নই। এ ভারতে সবকিছু মেলে, সাদা-বাজারে না হল তো কালোবাজারে, শুধু চাকরি মেলে না।

সুব্রতা একটুখানি ভাবনার ভান করে বলল, ঠিক আছে। হয়ে যাক বিয়ে নির্বিঘ্নে। চাকরিও তোর পার্মানেন্ট হয়ে যাক। ডিভোর্স করে তখন বেরিয়ে আসব। কেমন?

ডিভোর্স বুঝি ইচ্ছে করলেই হয়?

এমন অবস্থা করে তুলব, রুণু রায় নিজেই মামলা জুড়তে দিশে পাবে না। নির্ভাবনায় থাক তুই, খুব মন দিয়ে কাজকর্ম কর্, বস যাতে খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি পার্মানেন্ট করে নেয়।

সুব্রতা ব্যস্ত এখন। আরও কয়েকটি মেয়ে দোকানের ভিতরে। একসঙ্গে মিলে হয়তো-বা বিয়ের সওদা করতে এসেছে। খবরটা দিয়ে আবার সে দোকানে ঢুকে গেল।

মেয়ের প্রণয়পাত্র বলে অরুণের উপর জগন্নাথের সন্দেহ। এ হেন ব্যক্তিকে মেয়ের বিয়ের সময় বাড়ির উপর ডাকবেন না, সুব্রতা ভেবেছিল। নেমন্তন্নে অরুণ বাদ পড়ে যাবে, সেইটেই স্বাভাবিক।

হল ঠিক উল্টোটি। গভীর জলের মাছ জগন্নাথ—অনেক গভীরে বিচরণ। নিজেই হঠাৎ অরুণের টেবিলে এসে চাপাগলায় বললেন, অবসর হলে আমার কামরায় একবারটি এসো বাবা। কথা আছে।

কামরার ভিতর নিমন্ত্রণ-চিঠি দিয়ে বললেন, অতিথি-অভ্যাগতের মতন গেলে হবে না কিন্তু বাবা। সুব্রতা তোমার বোনের মতো। আমি বুড়োমানুষ—দেখাশোনা খাটাখাটনি করে তোমাদেরই কাজ তুলে দিতে হবে।

যা বাব্বা, বোন বানিয়ে দিল রাতারাতি! ঐ আনন্দে থাকো বুড়ো। বিয়ে দিলেই আজকাল আর তালাচাবি পড়ে না। পদ্মপত্রে জল—পাকাপাকি বলে কিছু নেই আমাদের আজকের নতুন দুনিয়ায়।

বিয়ের দিন যথাসময়ে হাজির দিয়েছে। জগন্নাথ অতিমাত্রায় উদার—'বাবা' ছাড়া বুলি নেই মুখে। 'এসো বাবা, এসো এসো—' পথের উপর থেকেই হাত বাড়িয়ে আহ্বান করলেন।

আগের দিনের সেই কথাবার্তার জের ধরে বললেন, সকাল সকাল আসতে বলেছিলাম। বরযাত্রীরা সব এসে গেছে। পয়লা ব্যাচেই বসেছে। টুকু দেখাশোনা করছে, তুমি থাকলে দু-জন হতে।

আহা রে, মরে যাই আর কি! টুকু জগন্নাথের ছেলে—টুকুর পাশাপাশি অরুণের নাম জুড়ে দিলেন। অরুণও সুব্রতার ভাই—কথাটা পুনশ্চ স্মরণ করিয়ে দেওয়া। স্নেহশীল জ্যেষ্ঠভ্রাতা। মেলা টাকাকড়ি থাকলে, নিদেন পক্ষে ভদ্রগোছের একটা পাকা-চাকরি থাকলে, অরুণই বরপাত্তোর হয়ে ছাঁদনাতলায় যেত। তা যখন নেই,

ভাই তো ভাই-ই সই। চোরের রাত্রিবাসই লাভ। কনের ভাই হয়ে উত্তম খাওয়াটা মিলছে, সেটা ছাড়ব কেন। রাত্রিবেলার রুটির খরচা বেঁচে গেল আজ।

টুকুকে পেয়ে জগন্নাথ বললেন, জায়গা নেই আর, একটা জায়গাও হবে না? যাহোক করে অরুণেন্দুকে বসিয়ে দাও। বেচারি অনেক দূর যাবে, বেশি রাত হয়ে গেলে মুশকিল। ভিতরে চলে যাও বাবা টুকুর সঙ্গে—

একদিকে আলাদা একটু জায়গা করে অরুণকে বসিয়ে দিল। বিয়ের কনে হয়েও সুব্রতা বিষম ব্যস্ত বান্ধবীদের নিয়ে। খর-খর করে এদিক-সেদিক ঘুরছে। এরই মধ্যে একটু একলা হয়ে অরুণের কাছে এসে দাঁড়াল।

অরুণ বলে, দারুণ সেজেছিস রে! কী ভালো দেখাচ্ছে, চোখ ফেরে না।

ফেরা চোখ। প্লেটে নজর দে, নয়তো গলায় কাঁটা বিঁধে যাবে।

কাটলেটে কাঁটা কোথায়?

সুব্রতাকে ছেড়ে এবার কাটলেটের গুণ ব্যাখ্যান: মুচমুচে কাটলেট ভেজে ভেজে দিচ্ছে, খেতে বড় মজা। দেখ্ না খেয়ে একটা।

ভাল লাগছে তোর, তুই খা। প্রাণ ভরে খেয়ে নে।

কটমট করে তাকিয়ে সুব্রতা ঝুড়ি থেকে আরও খানকয়েক অরুণের প্লেটে ফেলে দেয়। তখনই যেন হুঁশ হল অরুণেন্দুর: ও, বিয়ের আগে খেতে নেই বুঝি তোর। কিন্তু বিয়ে তো রাত দুপুরে। ততক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, মজা পাবি নে।

সুব্রতা শান্ত চোখে তাকিয়ে পড়ল, স্বরে তীব্রতা: তুই কি মানুষ?

অরুণ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বলে, আমারও ঠিক সেই সন্দেহ। ছিলাম একদিন, এখন আর নই। বছরের পর বছর উমেদারি করে পায়ে কড়া পড়ে গেছে, মনেও পড়েছে।

সুব্রতা দপ করে জ্বলে উঠল: বিনয় নয়, সত্যি সত্যি তাই। মানুষ হলে এ-বাড়ি ঢুকে তারিফ করে ভোজ খেতে পারতিস নে।

কী পারতাম? ঘরে শুয়ে এপাশ-ওপাশ গড়াগড়ি দেওয়া আর ফোঁসফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলা? কোনো মুনাফা নেই, দুনিয়া স্বার্থপর—কেউ তাকিয়েও দেখত না। তার চেয়ে মুফতের কাটলেটে ঠেসে উদর ভর্তি করে নিই। বুদ্ধিমানে তাই করে।

হাসতে হাসতে আবার বলে, ভাল ঘর-বর পেলি, আমোদ করে পেট ভরে ভোজ খাচ্ছি—তা এমন রেগে গেলি কেন বল্ দিকি? প্রেম-ট্রেম নয়তো রে? আমাদের গরিব ঘরে এ ঝঞ্ঝাট নেই। আমার বউদি আছে, তোরই বয়সি। কাপড় সিদ্ধ করে ডোবার ঘাটে আছড়ে আছড়ে কাচে, ধান ভানে, ভাত রাঁধে, কলসি কলসি জল বয়ে নিয়ে আসে। অত খাটনি খাটে, তার মধ্যে প্রেম সেঁধোবার ফাঁক কোথা? ও-জিনিস তোদের পক্ষেই সম্ভব বটে সুব্রতা। ভাল দাঁড়ে জুত করে বসতে পেলে কাকাতুয়া-ময়না-টিয়ারা তবেই 'রাধাকৃষ্ণ' বুলি ছাড়তে লেগে যায়।

বরের ঘর করতে সুব্রতা তো বাঙ্গালোর চলে গেল। তারপর পুরো হপ্তাও কাটেনি—হারানচন্দ্র হেলতে দুলতে অফিসে এসে দর্শন দিলেন। চমক খেল অরুণেন্দু, চোখের উপরে যেন ভূত দেখছে। কাষ্ঠহাসি হেসে বলে, সেরে এলেন?

সারব না মানে? বাবা বদ্যিনাথের চরণে গিয়ে পড়েছিলাম। বাবার মাহাত্ম্য, সেই সঙ্গে স্থানমাহাত্ম্য—দেওঘরের হাওয়া জল আর প্যাঁড়া। প্যাঁড়া গোড়ার দিকে একেবারে ছুঁতাম না। একটা দুটো করে বাড়তে বাড়তে দৈনিক এখন আধসেরে উঠে গেছে। তাই খেয়ে হজম করছি। মর্নিংওয়াক করি যশিদি স্টেশন পর্যন্ত —পায়ে হেঁটে, নিত্যিদিন।

সোমবার থেকে কাজে বসবেন, আজ এসে দেখাশুনা করে যাচ্ছেন।

নিজ চেয়ারে গিয়ে অরুণেন্দু ধপ করে বসে পড়ল। স্বগত চিন্তা শব্দ হয়ে বেরুল : ক্যানসারও সারে আমার কপালে!

পাশের শৈলবাবু শুনতে পেয়ে বললেন, ছোটখাটোয় সুখ হয় না বুঝি ভায়া? চিরকেলে খাইয়ে-মানুষ—খাওয়ার অত্যাচারে অম্বলের ব্যথা ধরত। বলছেন ক্যানসার।

দোর ঠেলে অরুণ জগন্নাথের কামরায় ঢুকল : ক্যানসার সেরে-সুরে হারানবাবু যে চাঙ্গা হয়ে ফিরলেন।

একগাল হেসে প্রসন্ন কণ্ঠে জগন্নাথ বললেন, ভাল হয়েছে। বিস্তর দিনের পুরানো লোক। বলতে কি, তোমায় দিয়ে কাজ হচ্ছিল না বাপু।

কাজ তো ষোলআনাই হয়েছে। মেয়ে বেঁকে বসেছিল—বিয়েথাওয়া করে দিব্যি সে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল।

জগন্নাথ আর এখন উপরওয়ালা নন, চেপেচুপে কথা বলতে যাবে কেন? কপালে আঁচড় ছিল—চার মাস একনাগাড় চাকরি। মাইনের টাকা হাতে পেয়েই মাসে মাসে বাড়ি চলে গেছে, মা-বউদির তত্ত্বতালাস নিয়ে সংসার-খরচা দিয়ে এসেছে। সুব্রতার উপর অরুণ কৃতজ্ঞ, এটুকুও তার জন্য।

সুব্রতা মহানন্দে বরের ঘর করছে, অরুণ পুনর্মূষিক।

॥ নয় ॥

পলি চাকরি করে ইমপ্রুভমেন্ট-ট্রাস্টের এস্টেটস অফিসে। ক্ল-ফলার মতন দিন কতক খুব সে লেগে পড়ে ছিল, অরুণ পাত্তা দেয় না বলে ইদানীং উদাসীন। সেই অরুণ দশটার মুখে পলির অফিসের সামনে পায়চারি করছে। এসে পড়তেই একগাল হেসে বলে, অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই। অফিসটা জানা ছিল, ভাবলাম এইখানে দাঁড়ালে দেখা হয়ে যাবে।

পলি অবাক হয়ে বলে, আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন ?

নয় তো ময়লা জমে ঐ যে ডাঁই হয়ে আছে—সুবাস নিচ্ছি এখানটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ? দশটা বাজে, ইনিয়ে বিনিয়ে বলার সময় নেই। আমি বললেও আপনার শোনার সময় হবে না। কাশীনাথ কর আপনার বাবা ?

ঘাড় নাড়ল পলি।

ম্যাথুস এণ্ড হেণ্ডারসনে কাজ করেন তিনি ? প্রোমোশান হয়েছে কিছুদিন আগে ?

হ্যাঁ—

খুশি হয়ে অরুণেন্দু বলে, বাঃ বাঃ, ঠিক মিলে যাচ্ছে। জরুরি কথা আপনার সঙ্গে। ছুটির মুখে আবার এইখানে এসে দাঁড়াব, কেমন ?

পলির সবুর সয় না। জেদ ধরে বলে, যা বলবার এখনই বলুন। চলুন, পার্কে গিয়ে বসিগে।

অফিসে লেট হবে—

হয়, হোক গে। কামাই হলেই বা কী!

যেতে যেতে অরুণেন্দু বলল, আপনার মা শুনেছি অতিশয়

স্নেহময়ী। ভগবতীর মতন।

পলি তাকিয়ে পড়েঃ কে বলল?

অরুণেন্দু হেসে বলে, ঝানু উমেদার আর পাকা চোর সুলুক-সন্ধান নখাগ্রে নিয়ে কাজে নামে। আপনার মায়ের কাছে যেতে চাই একবার। আপনিই নিয়ে যাবেন।

বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে আদুরে গলায় পলি বলে, 'আপনি-আপনি' করেন, কানে বড় বিশ্রী শোনায়।

তুমিই তো বলতে চাই। চাকরিবাকরি চাই একটা তার আগে। অতি-অবশ্য চাই, শলাপরামর্শ তারই জন্যে।

বলে দিল তো আবার কি! 'তুমি' সেই মুহূর্ত থেকে চালু। অরুণেন্দু বলে, অফিস আজ তবে সত্যি সত্যি কামাই করলে! পার্কের বেঞ্চিতে বসে কি হবে—চলো তোমাদের বাড়ি। কর্তা নেই এখন—মা আছেন বড়দিদি আছেন প্রণব আছে। আলাপ-পরিচয় করিগে চলো।

পলি সকৌতুকে বলে, আমাদের সকলের সব খবর নিয়েছ তুমি।

পুঁথি পড়ার মতন অরুণ বলে যাচ্ছে, মা তো তাসের নামে পাগল। চারজন হচ্ছি—তোমরা দু-বোন মা আর আমি। মা আবার ব্রিজ-টি্জ বোঝেন না—টোয়েন্টিনাইন খেলা যাবে। চলো।

পলি হেসে খুনঃ কিচ্ছু অজানা নেই তোমার! সাক্ষাৎ অন্তর্যামী!

অরুণ বলে, পিছনের খাটনিটা জানো না তো। শুধু তোমাদের এই একটা জায়গাই নয়। যেখানে দেখিবে ছাই—সন্ধান একটু পেলেই হল, ছাই উড়োতে ছুটলাম।

চোরেরও এমনি। নিশিরাত্রে সিঁধ কেটে টাকার-ঘটি পাচার করেছে, সকালে উঠে দেখতে পেলেন। গৃহস্থ হায়-হায় করে বুক চাপড়াচ্ছে, আপনারা তারিফ করছেনঃ বাহাদুর বটে চোরচূড়ামণি! সকল ঘর বাদ দিয়ে বেছে বেছে ঠিক ঐ ঘরে ঢুকেছে, এবং বাক্স

নয় সিন্দুক নয় মেঝে খুঁড়ে টাকার-ঘটি বের করেছে ঠিক। বাহাত্মর তো বটেই, কিন্তু কতদিনের কী প্রচণ্ড অধ্যবসায় পিছনে রয়েছে, ক'জনে তার খবর রাখে! পরের বাড়ি ঢুকে হুট করে অমনি সিঁধ কাটা যায় না, ছ'টি মাস নেহাত পক্ষে বাড়ির চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করেছে। কোন জিনিষটা কোথায় রাখে, মুখস্থ একেবারে। মানুষই বা ক'জন, কে কখন ঘুমোয়, কার ঘুম গাঢ় কার ঘুম পাতলা, রাতে বেরুনোর রোগ আছে কিনা কারো ইত্যাদি ইত্যাদি। বাড়ির হালচাল তন্নতন্ন করে জেনে বুঝে তবে সিঁধকাটি ধরেছে।

একখানা চুরি নামানো এবং একটি চাকরি বাগানো—পদ্ধতি উভয়েরই প্রায় একপ্রকার। তদ্বিরশাস্ত্রের পরমপ্রাজ্ঞেরা বলে থাকেন —ডিরেকটর নয়, ম্যানেজার নয়, সেকসনের বড়বাবুটি কে খোঁজখবর নাও আগে। তাঁর নিচেই বা কারা সব আছে? আরদালি-বেয়ারারাও হেলার বস্তু নয়। থাকেন বড়বাবু কোনখানে? বাড়িতে কে কে আছে, তার মধ্যে অধিক পেয়ারের কে? ভোজন ব্যাপারে কোন কোন বস্তুতে আসক্তি? গোপন দোষদৃষ্টি যদি থাকে, তারই বা হদিস কি? মোটের উপর ডিরেকটর ম্যানেজার প্রমুখ বড় বড় চাইদের ধরে সামান্যই কাজ পাওয়া যায়। এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট-লেটারে সই করেন বটে, কিন্তু চাকরি তাঁরা দেন না। নিচে থেকে সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরি হয়ে আসে। পুতুল-নাচের পুতুলের মতন হাতখানা তাঁদের সই মেরে যায়, টেরই পান না নেপথ্য থেকে কলকাঠি টিপছে অন্য মানুষ। ধরাধরি অতএব নিচু থেকে বিধেয়, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গেলে নির্ঘাৎ পতন। শাস্ত্রের বিধানও তাই: দুর্গোৎসবে বসে পুরুত সকলের আগে গণেশপূজো সারেন। বাচ্চাঠাকুরকে ভোগে তুষ্ট করে তবে জননী দশভুজা অবধি এগোনো যায়।

চাঁদ-কেবিনের জন্মকাল থেকেই লক্ষ্য করা গেছে, সাড়ে-নটা বাজতেই সামনের রাস্তা দিয়ে এক প্রবীণ ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে

চলে যান, ট্রাম-রাস্তায় পড়ে ট্রাম ধরেন। হাতে টিফিন-কৌটো এবং বগলে ছাতা—শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সর্বঋতুতেই। অতএব অফিসের কেরানি সন্দেহ নেই। ফিরতি মুখে চাঁদ-কেবিনে ঢুকে হাফ-কাপ চা-ও খেয়ে যান মাঝে-মধ্যে। অরুণেন্দু উমেদার হিসাবে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়ও করে রেখেছিল। নাম গঙ্গাধর মুখুজ্জে, ম্যাথুস এণ্ড হেণ্ডারসন কোম্পানির পারচেজিং-সেকসনে জনৈক এ্যাসিস্টান্ট। বিস্তর দুঃখ করেছিলেন মুখুজ্জেমশাই: সে রাম নেই, সে অযোধ্যাও নেই। নামটাই শুধু বিলাতি, কোম্পানি বিলকুল দেশি হয়ে গেছে। অতবড় অফিস কুড়িয়ে লালমুখো সাহেব একটা অষুধ করতেও পাবে না। ম্যাথুজের চেয়ারে মাধব প্রামাণিক এখন জেনারেল ম্যানেজার হয়ে বসেছেন। রাস্তাটা পর্যন্ত দেশি বানিয়ে ছেড়েছে—ক্লাইভ স্ট্রিট পালটে দিয়ে নেতাজী সুভাষ রোড। একটা গুণ, এরা কখনো চাকরি খায় না। বয়সের বাঁধাবাঁধিও নেই, এই দেখ না, চল্লিশটা বছর চালিয়েছি—তাগত থাকলে আরও চল্লিশ বছর অক্লেশে চালাতে পারব। সে আমলে এই রকম তো চলেছে, এই দেশি আমলে এরা কি করবে তা অবশ্য সঠিক বলতে পারব না।

পাঁচ-সাত দিন পাশাপাশি বসে চা খেয়েছিল, মুখুজ্জেমশায় তখন এইসব বলতেন। কিছুদিন আর তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। মোটা রকমের অসুখ করেছে ঠিক, অল্পেস্বল্পে অফিস কামাইয়ের বান্দা এঁরা নন। আরও কিছুদিন পরে 'বলো হরি, হরিবোল' দিয়ে মড়া নিয়ে যাচ্ছে চাঁদ-কেবিনের সামনে দিয়ে। দলের মধ্যে কেবিনের দু-তিনটি চেনা খদ্দের।

কে চললেন রে পল্টু?

গঙ্গাধর মুখুজ্জে—

কী সর্বনাশ! আরও যে চল্লিশ বছর মুখুজ্জেমশায় চালাবেন, কথা আছে। এরই মধ্যে ছেড়েছুড়ে চললেন?

ক্যানসারও আরোগ্য হয়ে চাকরিতে ফিরে আসে, অরুণের এমনি কপাল। পুরোপুরি প্রাণত্যাগ, শবদাহ এবং শ্রাদ্ধশান্তির পরে

গঙ্গাধর মুখুজ্জে আশা করি ফিরবেন না। চরবৃত্তির গুণে প্রকাশ পেল, সেকশনের বড়বাবুটি অন্য কেউ নয়—কাশীনাথ কর, পলি করের পিতৃদেব। প্রেম অতএব অবিলম্বে ঝালিয়ে নেওয়া আবশ্যক। খুঁত রেখে কাজ নয়, ঘাঁটি বাঁধতে বাঁধতে সতর্ক ভাবে এগুচ্ছে। চাকরি ঠেকায় কে এবারে!

বাইরের ঘরে কাশীনাথ খবরের-কাগজ পড়ছেন। খবর মোটামুটি হয়ে গেল, বিজ্ঞাপন উল্টেপাল্টে দেখছেন। অরুণেন্দু ঢুকে পড়ে গড় হয়ে প্রণাম করল।

কাশীনাথ মুখ তুললেন। বড়বাবু হবার পর থেকে প্রণামাদি দেদার এসে থাকে—শুখো-প্রণামে তিনি বিরক্ত হন। অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, কি চাই আপনার?

প্রয়োজন বলে ফেলা সঙ্গে সঙ্গেই উচিত হয় না, যথোচিত ক্ষেত্র বানাতে হবে আগে। অরুণেন্দু বলল, আজ্ঞে, 'আপনি' কেন বলছেন? পুত্রতুল্য আমি।

কাশীনাথ ভ্রূকুটি করলেন: হল তাই বাপু —'তুমি' 'তুমি'। কী বলবার আছে, বলে ফেল। অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

আপনি আমার দেশের লোক।

বটে? বাড়ি কোথায় তোমার?

পল্লীশ্রী কলোনিতে খান দুই চালা তুলে নিয়েছি। পৈত্রিক ভিটে যশোর জেলার সাতঘরা গাঁয়ে। এখন পাকিস্তানে চলে গেছে।

কাশীনাথ বললেন, ঠাকুরদার আমলে সাতঘরা বাড়ি ছিল, তা-ও বের করে ফেলেছ?

পরমোৎসাহে অরুণেন্দু বলে, ছোটখাট একটু আত্মীয়-সম্বন্ধও আছে, হিসাবে বেরুচ্ছে।

হিসাব থাক, এসো তুমি এখন। আমি চানে যাবো।

যে আজ্ঞে—বলে তটস্থ হয়ে অরুণ উঠে দাঁড়াল। আর একবার

পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকিয়ে চকিতে নিষ্ক্রান্ত।

ইঙ্গিত মাত্রেই উঠে পড়বে, গড়িমসি করবে না—তদ্বির-শাস্ত্রে যাঁরা মহামহোপাধ্যায় তাঁদের উপদেশ। অরুণ আগে জানত না। এমনিধারা 'এসো'র উত্তরে ধানাই-পানাই করত কিছুক্ষণ। তাড়া খেয়ে তারপর মুখ চূণ করে পথে নামত। আনাড়ি কাঁচা উমেদার ছিল তখন। বের হয়ে গিয়ে পথে নামবে না সে আজ, পথ থেকে উঠেও এ-ঘরে আসেনি। গোড়া বেঁধে কাজ। গোড়ায় অনেকক্ষণ আগে অন্দরে এসেছিল, অন্দর থেকে বাইরের-ঘরে কাশীনাথের কাছে। কাশীনাথ বিদায় দিলেন তো গুড়-গুড় করে আবার সেই অন্দরে।

ঘণ্টা খানেক পরে কাশীনাথ অফিসে বেরুচ্ছেন। বেরিয়ে যাবার পরে অন্যদিন অরুণ আসে। আজকেই সর্বপ্রথম তাঁর সামনে আত্ম-প্রকাশ। বাইরের-ঘরে দেখা দিয়ে এসেছে, আবার ভিতরেও কাশীনাথ দেখতে পাচ্ছেন তাকে। প্রণবের সঙ্গে চোর-পুলিশ খেলছে সে—ঘর বারান্দা গলিতে পালাচ্ছে আর ধরা পড়ছে।

সবিস্ময়ে তাকাতে তাকাতে কাশীনাথ বেরিয়ে গেলেন।

অরুণ মনে মনে হাসে: হাতে যখন চাকরি, না দিয়ে যাবে কোথা বাছাধন! আটেঘাটে ধরেছি, নয়ন মেলে দেখে দেখে যাও।

পলির দিদি ডলি বিধবা। ছেলেপুলে নেই, টাকা আছে। বর মারা গেলে ইনসিওরেন্সের মোটা টাকা হাতে এসে গেল। মেয়ের শোক-দুঃখ কাশীনাথেরও ঘোরতর লেগেছে—চোখের আড়ালে মেয়ে রেখে সোয়াস্তি পান না। সেই থেকে ডলি বাপের সংসারে। দাবরাবের সঙ্গে আছে দস্তুরমতো।

পিকনিক আজ ডলিদের সমিতির, সকাল থেকে তারই কেনা-কাটায় বেরিয়েছিল। ফিরছে যে এখন, চানটান করে তৈরি হয়ে আবার বেরুবে। অরুণ আর প্রণব বাড়িময় ছুটোছুটি করছে।

অবাক হয়ে ডলি বলল, অবেলায় এখন তোমরা খেলাতে লেগেছ ?

অরুণেন্দু বলে, প্রণবের কাল এগজামিন বড়দিদি।

পড়াশুনো না করে খেলছে তাই ?

পড়ছেই তো। আমি পড়াচ্ছি—পাটিগণিত দেখুনগে টেবিলের উপর খোলা। অঙ্ক কষতে কষতে দেখি হাই তুলছে। তখন খেলায় নামিয়ে আনলাম। ঘুম-ঘুম ভাবটা কেটে যাক, আবার নিয়ে বসাব। যাবে কোথা!

তাই। কিছুক্ষণ খেলাধুলোর পর আবার প্রণব অঙ্কে বসেছে। ওজরআপত্তি নেই, ফূর্তিতে কষে যাচ্ছে। লেখাপড়ায় এমন টান আগে দেখা যায়নি কখনো। গিন্নিঠাকরুন সুবাসিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। সবিস্ময়ে বলেন, পাঁচটা মিনিট ওকে এক জায়গায় বসিয়ে রাখা যায় না—অরুণ ঠিক মন্তোর জানে, পেন্নুকে বশ করে ফেলেছে।

[বশ সবাইকে হতে হবে। সবুর করো না কয়েকটা দিন—ছোট ছেলে প্রণব থেকে কর্তামশায় কাশীনাথ অবধি কেউ আর বাকি থাকবে না। যে মন্তোরে যে দেবতা তুষ্ট। এ-বাড়ির ইঁদুরটা আরশুলাটাও বশে এসে যাবে। গঙ্গাধর মুখুজ্জের চাকরি কবজায় না এসে যায় কোথায় দেখি!]

ডলি-পলি দুই বোন তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরুল। ডলি সুবাসিনীকে ডেকে বলে, ফিরতে দেরি হতে পারে মা, ব্যস্ত হোয়ো না।

ডলি পিকনিকে যাচ্ছে। পলি আফসে। বড়বাবু বলে কাশীনাথ সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েন। পলির সে তাড়া নেই, ধীরে সুস্থে দেরি করে যায়।

অরুণেন্দু বলল, গাড়ি গ্যারেজে পড়ে রয়েছে। কর্তা নিয়ে যাননি—আবার বিগড়েছে বুঝি ?

ছিলেন কাশীনাথ ডেচপ্যাচ-ক্লার্ক, উন্নতি হয়ে পারচেজিং-সেকশনের বড়বাবু। বড়বাবু হলেও কেরানি বই কিছু নন—পদমর্যাদার দিক দিয়ে তেমন-কিছু নয়, উন্নতি হয়েছে পাওনাগণ্ডায়।

যেহেতু পারচেজিং অর্থাৎ কেনাকাটার সেকশন, ইতিমধ্যেই কাশীনাথ সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মোটরগাড়ি কিনে ফেলেছেন। মোটর হাঁকিয়ে ইজ্জত বাড়ে ঠিকই, কিন্তু গাড়ি রাখার এত ঝঞ্ঝাট কে জানত!

অরুণ তাই বলছে, পুরানো গাড়ির বড্ড হ্যাঙ্গামা। নিত্যিদিন বিগড়ে বসে থাকে। তালি দিয়ে দিয়ে টাকার শ্রাদ্ধ।

ডলি বলে, না গো, গাড়ি ঠিক আছে—বিগড়েছে ড্রাইভার। শহরে এক গাদা নতুন ট্যাকসি বেরিয়েছে, চাহিদা বুঝে যত ড্রাইভার জোট বেঁধে লম্বা লম্বা মাইনে হাঁকছে। গতিক দাঁড়িয়েছে, বাবু যে মাইনে পান তাঁর ড্রাইভারও সেই মাইনে দাবি করছে।

সুবাসিনী মন্তব্য ছাড়লেন: ড্রাইভার রাখা আর হাতি রাখা একরকম হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ড্রাইভারের খরচাই বোধহয় বেশি।

ডলি হেসে উঠে বলল, তবে মা ড্রাইভার না খুঁজে বাবাকে হাতি কিনতে বলো একটা। সে মন্দ নয়—ড্রাইভার দিয়ে না চালিয়ে হাতি জুড়ে দিও, তোমাদের গাড়ি হাতিতে টেনে নিয়ে বেড়াবে।

পলি বলে, গাড়ি আমাদের হল কিসে? খবরদার খবরদার, অমন কথা মুখেও আনবি নে দিদি। শুনে কেউ হয়তো ম্যানেজারের কানে তুলে দিল। গাড়ি তোর, ব্লু-বুকে তোর নাম রয়েছে। নিজেও তুই সেই ডাঁটে চলবি।

কেরানি মানুষ মোটরগাড়ির মালিক হলে লোকে নানান কথা বলবে। ভেবেচিন্তে কাশীনাথ গাড়ি তাই ডলির নামে কিনলেন। বলেন, সাধআহ্লাদ এই বয়সেই সব চুকে গেল, শ্বশুরবাড়ির ঐ অভ্যাসটুকু শুধু বজায় রেখেছে—মোটরগাড়ি চড়ে বেড়ানো। জামাইয়ের লাইফ-ইনসিওরেন্সের টাকা এসে গেল, একটা ছ্যাকড়া মোটর জোগাড় করে দিলাম সস্তাগণ্ডার মধ্যে।

কথার পৃষ্ঠে পলি জিনিসটা মনে করিয়ে দিল। অরুণেন্দু এদিকে বই-খাতা গুছিয়ে দিয়ে প্রণবকে বলল, এখন আর নয়—ছুটি

তোমার। রাত্রে একবার ঝালিয়ে রেখো, সকালবেলা এসে আবার দেখব।

সুবাসিনীকে বলে, গাড়ির চাবি দিন মা।

চাবি কি হবে? সুবাসিনী বুঝতে পারেন না।

বড়দিদির সেই তো শিবপুরে পিকনিক। ট্যাকসি পান না পান, অতখানি পথ বাসে ঢিগ-ঢিগ করতে করতে যাবেন—আমি চট করে পৌঁছে দিয়ে আসি। পলি দেবীকেও অমনি অফিসে নামিয়ে দিয়ে যাব।

সুবাসিনী অবাক হয়ে বললেন: বলো কি গো, মোটর চালাতে পারো তুমি?

অরুণেন্দু ঘাড় কাত করল: প্রাকটিশ নেই অবিশ্যি অনেক দিন—

ডলি প্রশ্ন করে: আপনার লাইসেন্স আছে?

একখানা করে রেখেছি, যদি কখনো দরকারে লাগে।

করজোড় করল অরুণ: 'আপনি' 'আপনি' করবেন না বড়দিদি। মনে কষ্ট লাগে, যেন পর করে দিচ্ছেন।

পাকা হাত, মোটর-ড্রাইভারিই যেন অরুণের পেশা। প্রাকটিশ নেই ইত্যাদি বাজে কথা, বিনয়ের কথা। বটানিক্যাল গার্ডেন অবধি এতখানি পথ বিনি ঝঞ্ঝাটে চলে এলো, কাশীনাথের প্রাচীন গাড়ি নিয়ে পথে বেরিয়ে কালেভদ্রে কদাচিৎ এমন ঘটে।

ডলি বলল, পিকনিকে তোমারও নেমন্তন্ন ভাই। থাকো, খেয়েদেয়ে একসঙ্গে সকলে ফেরা যাবে।

অর্থাৎ বাড়ির মোটরে এসে স্ফূর্তি লেগেছে, মোটরেই আবার ফিরতে চায়। অরুণের দোমনা ভাব দেখে বলল, জরুরি কাজকর্ম আছে নাকি খুব?

অরুণ বলে, আছে বড়দিদি। সাড়ে-পাঁচটার মধ্যে আমায় ফেরত পৌঁছতে হবে। এত তাড়াতাড়ি হবে না তো আপনাদের।

হোক না হোক—আমি চলে যাব।

অরুণ অতএব রয়ে গেল। মুফতে একবেলা ভালমন্দ খেয়ে মুখ বদলানো যাচ্ছে। কে দেয়!

পরের দিন প্রণবের একজামিন। বাড়ির মধ্যে কেউ প্রায় ওঠে নি—অরুণেন্দু এসে হাজির। প্রণবকে ডেকে তুলে পড়ায় বসাল।

সুবাসিনীকে বলল, কর্তামশায়কে ট্রামে-বাসে যেতে হচ্ছে। ওঁর কষ্ট হয়। তা ছাড়া সেকশনের বড়সাহেব—ইজ্জতেও ঘা পড়ে। আমি পৌঁছে গিয়ে আসব মা, ওঁকে বলে আসুন।

কাশীনাথ যথারীতি খবরের-কাগজ নিয়ে বসেছেন, অরুণের ডাক পড়ল। কর্তার চোখের উপরে অন্দর থেকে বেরিয়ে এসে সে পদধূলি নিল।

কাশীনাথ বললেন, ড্রাইভিং-এ তোমার চমৎকার হাত, ডলি বলল। আমাদের যে ড্রাইভার ছিল, তার চেয়ে নাকি অনেক ভাল। এম-এ পাশ করা ছেলে মোটর-ড্রাইভারি শিখতে গেলে কেন তুমি?

অরুণেন্দু বলে, দু-চোখের মাথায় যা-কিছু পড়ে, শিখে রেখে দিই। আমার কোন বাছবিচার নেই। পাঁচ পাঁচটা বছর ধরে কাজকর্ম খুঁজছি—কপাল খারাপ, কোন-কিছুই গাঁথে না। রাজা ব্রুসের মতো আমিও নাছোড়বান্দা। আশায় আশায় কোয়ালি-ফিকেশন বাড়িয়ে যাই। ড্রাইভারি থেকে ম্যানেজারি যে কাজে দেবেন, পিছপাও নই। কিন্তু দিয়ে কেউ দেখলেন না, এই বড় দুঃখ।

ম্যানেজারের নাম উঠতেই কাশীনাথ ক্ষেপে উঠলেন: ম্যাথুস অ্যাণ্ড হেণ্ডারসনের ম্যানেজারিতে আজকাল কোয়ালিফিকেসন লাগে নাকি? নামসইটা কায়ক্লেশে করতে পারলেই হল। দেখে এসো একদিন আমাদের মাধব প্রামাণিককে। যে আসনে বসে খোদ ম্যাথুস সাহেব বাঘের গর্জন ছাড়ত, প্রামাণিক সেখানে বসে মেনি-বিড়ালের মতন মিউ মিউ করছে। জেনারেল ম্যানেজার!

বড়বাবু হয়েই শেষ নয়, বোঝা যাচ্ছে। ম্যানেজারের চেয়ার

অবধি তাক। আসল কথা, চেয়ার খালি করে দিয়ে প্রামাণিকমশায় চিতায় ওঠে না কেন ঐ গঙ্গাধর মুখুজ্জের মতো।

নামবার মুখে কাশীনাথ শতকণ্ঠে তারিফ করেন: না, ডলি একবর্ণ বাড়িয়ে বলেনি। লঝ্‌ঝড় গাড়িতে এতখানি পথ নিয়ে এলে—তা যেন গদিতে শুয়ে এলাম, গাড়িতে চড়েছি গায়ে-গতরে একবিন্দু মালুম হল না।

নেমে দাঁড়িয়ে বললেন, পৌঁছে তো দিলে বাপু, ফেরত যাবার কি? তখন আরো কষ্ট। ছোকরাদের বাড়ি যাবার টান—লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বাসে ওঠে—সে লড়াই বুড়োমানুষ আমরা পেরে উঠিনে। বাস আসে আর চলে যায়—স্ট্যাণ্ডে বুড়বার্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

অরুণেন্দু রা কাড়ে না, স্টিয়ারিং ধরে নির্বাক হয়ে আছে।

কাশীনাথ এবারে স্পষ্টাস্পষ্টি বলেন, পৌঁছে দিয়ে গেলে তো ফেরতও নিয়ে যাবে বাবা। সাড়ে-পাঁচটা নাগাদ চলে এসো।

আমতা-আমতা করে অরুণ বলে, ছেলে পড়াই ঐ সময়টা। অল্প টাকা দেয় বলে ইস্কুল থেকে ফিরেই অমনি পড়তে বসে। রাত্রেও আছে একটু--দোকানে খাতা লেখার কাজ। কাঁধে বিষম দায়িত্ব স্যার, অথচ কিছুই করতে পারছি নে—মনের মধ্যে সর্বক্ষণ চাবুক মারে।

এত কথা কাশীনাথ কানে নিলেন না। ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, বাসেই ফিরব—কী আর উপায়! যত রাত হয় হবে। ট্যাকসি তো নিত্যিদিন করা চলে না। ও-সময়ে পাচ্ছিই বা কোথায়?

চট করে অরুণেন্দু মনস্থির করে ফেলে: আসব সাড়ে-পাঁচটায়। নইলে আপনার কষ্ট হবে। গাড়ি লক করে রেখে যাচ্ছি। টুইশানিতে ইস্তফা আজ থেকে। সে বাড়ি যাবই না আর মোটে।

একটু ভেবে আপন মনেই যেন বলছে, চাকরি হলে সারাদিন খেটেখুটে গিয়ে আবার কি পড়াতে বসব? পৌঁছবই বা কেমন করে সাড়ে-পাঁচটায়? ছাড়তেই হত—সে জিনিস দশ-বিশ দিন আগেই না-হয় হয়ে যাচ্ছে।

চলল আপাতত এই অফিসে পৌঁছে দেওয়া ও ফেরত আনার কাজ। তা বলে ড্রাইভার নয় অরুণেন্দু—মোটেই নয়। বিনি-মাইনে আপ-খোরাকি। ড্রাইভারের মাইনে এম-এ পাশ শিক্ষিত ছেলে হাত পেতে নেয় কেমন করে? দেবেনই বা ওঁরা কোন লজ্জায়?

॥ দশ ॥

শুয়ে থেকে যশোদা একলাটি সর্বক্ষণ বিড়বিড় করে বকেন। চোখের কোণে জল গড়ায়। মানুষ দেখলে আরও বাড়িয়ে দেন। অঙ্গ পড়ে গেছে, আর মুখের জোরটা বেড়েছে সাংঘাতিক। মলিনা পারতপক্ষে তাই সামনে আসতে চায় না। অথচ না এসেই বা করে কি, সে ছাড়া বুড়োমানুষের আছে কে দেখবার?

শাশুড়িকে চান করাতে এসেছে। কাঁখে জলের কলসি হাতে ঘটি ও বড় মানকচু-পাতা। উঠে বসতে পারেন না, শুয়ে শুয়েই সমস্ত।

বউকে দেখেই যশোদার গালিগালাজ শুরু হয়ে যায়। মলিনা নয়, অরুই যেন সামনের উপর হাজির।

পোড়াকপাল তোর মতন ছেলের! ভাইয়ের এই সর্বনেশে দশা—যে-ভাই তোর জন্যে আর সংসারের জন্যে কী না করেছে! মা-ভাই-ভাজ সকলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে বুকিয়ে চাকরে-বাবু কলকাতায় ফূর্তি মেরে বেড়াচ্ছিস। এসে তো দুটো দিন খুব লম্বাচওড়া শুনিয়ে গেলি—বলি, সেই টাকায় কি চিরজন্ম সংসার চলবে?

মানকচু-পাতা যশোদার মাথার নিচে দিয়ে ঘটি থেকে মলিনা সন্তর্পণে জল ঢালছে, মাথা-ধোওয়া জল বেড়ার তলার ফুটো দিয়ে কানাচে যাচ্ছে। গামছা নিংড়ে পরিপাটি করে তারপর গা-মাথা মুছিয়ে দিল। যশোদার মুখের তিলার্ধকাল বিশ্রাম নেই, চানের মধ্যেও নয়—অবিরত চলছে। মাথা-খারাপের লক্ষণ। অভাব-অনটন দুশ্চিন্তা আর কুঁড়েঘরের মধ্যে এক শয্যায় বারোমাস তিরিশ দিন পড়ে থাকা—মাথার আর অপরাধ কি!

হঠাৎ যশোদা গর্জে উঠলেন: চাইনে কিছু, তোর টাকাপয়সা

ছোঁব না, ও হল গোরক্ত ব্রহ্মরক্ত। যেখানে খুশি থাক তুই, যা ইচ্ছে কর। যে পাতে খাবো না, তা কুত্তায় চাটুক।

বধূর দিকে চোখ ঘুরিয়ে বলেন, পোস্টকার্ড আনতে বলেছিলাম—

মলিনা বলে, এনেছি মা।

কালি-কলম নিয়ে এসো। আমি বলে যাচ্ছি, লেখো।

মলিনা ভয়ে ভয়ে বলে, বিকেলে লিখলে হবে। ভাত এনে দিই, বেলা হয়েছে বেশ।

যশোদা ধমক দিয়ে উঠলেন: লিখতে বলছি, লেখো তাই। এখন খাবো না—ভাত আনলে থালা ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

চিঠির কী বয়ান মা-জননী ছেড়েছিলেন, সঠিক জানা নেই। তিনি বলে গেলেন, আর মলিনা হাঁটুর উপর পোস্টকার্ড রেখে টেরা-বাঁকা লাইনে অগুস্তি বানান ভুল করে হুবহু লিখে গেল তাই।

রান্নাঘরের দিকে খুট করে কিসের একটু আওয়াজ। লেখা ফেলে মলিনা ছুটল। হুলোবেড়ালটা বড় উৎপাত করে। ঢাকাঢোকা আছে তো সমস্ত? দরজায় শিকল তোলা আছে?

আছে, ঠিক আছে।

দেখেশুনে ফিরে এলে যশোদা বললেন, কী লিখেছ—পড়ো একবার বউমা। শুনি।

আগাগোড়া পড়ে গেল মলিনা। মনোযোগ করে শুনে যশোদা এখানে ওখানে একটা-দুটো কথা জুড়ে দিলেন—আরো যাতে ঝাল বাড়ে। বললেন, বেশ হয়েছে। দশ কাজে তুমি ভুলে যেতে পারো, চিঠি আমার কাছে রইল। নিস্তারঠাকরুন এলে তাঁর হাতে দেবো, যাবার পথে তিনি ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে যাবেন।

অর্থাৎ এ অমূল্যনিধি বউমাকে দিয়ে ভরসা পাচ্ছেন না। দেওরের প্রতি দরদ উথলে উঠে ডাকবাক্সর বদলে হয়তো-বা ডোবার জলে ফেলল।

অফিস থেকে কাশীনাথকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে অরুণ চাঁদ-কেবিনে চায়ের বাটি নিয়ে বসেছে। কোন রকমে গলাটা একটু সেঁকে নিয়ে আবার খাতা লেখার কাজে ছুটবে।

ছুপুরবেলা চিঠি এসেছে, চাঁদমোহন এনে হাতে দিল। বলে, মায়ের চিঠি—তাই না?

ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে বলল, বেড়ে আছিস ভাই। ঘরবাড়ি আছে, মা-ভাই আছে—বড্ড একখানা দাগা পেলি তো ছুটলি সেখানে, আদর-সোহাগে জুড়িয়ে এলি। চিঠিপত্তোর বন্ধ করে মাঝে মাঝে আবার পরখ করে দেখিস, কে কতখানি উতলা হল। আমার শালা কেউ নেই। মরে যখন যাব—নিজে পারব না, তোদের বলা রইল ভাই—গোটা কয়েক লোক ভাড়া করবি, মড়া ঘিরে বসে তারা কাঁদবে। ভাড়া যা লাগবে, হিসেব করে রেখে যাবো আমি।

অরুণেন্দু চিঠি পড়ছে, আর মৃহু মৃহু হাসছে। চা বানানোর ফাঁকে চাঁদমোহন একবার এসে জিজ্ঞাসা করল: খবর ভাল তো?

হুঁ—বলে ঘাড় নেড়ে দিয়ে চিঠি সে পকেটে পুরে ফেলল। এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত, পোস্টকার্ডের চিঠি হলেও চাঁদমোহন ভিতরের মর্ম জানতে পারে নি। মলিনার হস্তাক্ষরের পাঠোদ্ধার চাট্টিখানি কথা নয়—অভ্যাস থাকা সত্ত্বেও অরুণ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। তার উপর চাঁদমোহন তো স্বমুখেই বলে থাকে, বিদ্যার ব্যাপারে কিছু 'কমজোরি' আছে সে।

গর্ভধারিণী মা কুচ্ছো করে যা-ই লিখুন—নতুন যিনি মা হয়েছেন, 'বাবা' 'বাছা' ছাড়া কথা নেই তাঁর মুখে। ইদানীং এমনি হয়েছে, অরুণ বিনে তাঁর একদণ্ড চলে না।

ভাঁড়ার দেখে সুবাসিনী মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন: একটি দানা চিনি নেই, র‍্যাশন পেতে আরও তো চার দিন। কী হবে?

হবে আবার কি! পেয়ে যাবেন।

হাসি-মুখে নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে অরুণ বলে দিল।

সুবাসিনী অবাক হয়ে বলেন, বলো কি! চিনি একদম বাজারে নেই—হীরে-জহরতের শামিল হয়েছে।

আছে সমস্ত মা। বাজার বদল করেছে—সাদাবাজার থেকে কালোবাজারে গেছে। তাতে আপনার কী আসে যায়? সাদা-বাজারের দরই দেবেন আপনি। কত লাগবে? র‍্যাশনের মালে তো কুলোয় না—কিছু বেশি করে নিয়ে নিন।

এই সমস্ত গুণের জন্যেই সুবাসিনী চোখে হারান অরুণকে।

এর পরে ভিন্ন এক প্রসঙ্গ। সুবাসিনী বললেন, গাড়ি যখন অফিস-পাড়াতেই যাচ্ছে, বাপের সঙ্গে পলিও তো যেতে পারে।

অরুণেন্দু লুফে নেয়: খুব খুব, কেন পারবেন না! বাড়ির গাড়ি রয়েছে—তাতে না গিয়ে কেন যে ঝুলতে ঝুলতে ট্রামে-বাসে যান বুঝিনে।

অন্যের সামনে অরুণ-পলি পর-অপরের মতন দূরত্ব রেখে চলে, 'আপনি' 'আপনি' করে বলে। বলল, বলে দিন মা পলি দেবীকে। কর্তার অফিস থেকে ওঁর অফিস মাইলখানেক বড় জোর। পাঁচ মিনিটে আমি পৌঁছে দেবো।

মেয়েকে সুবাসিনী আদেশ করলেন: আজকে তৈরি নও, আজ থাকল। বাসে যাবার তো দরকার নেই—বাপে-মেয়েয় কাল থেকে একসঙ্গে বেরুবে। অরুণের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। ওঁকে অফিসে নামিয়ে তারপর তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসবে। সামান্য পথ, অরুণ বলল—ওঁর অফিস থেকে পাঁচ মিনিটও লাগবে না।

পলি হেসে বলল, ঐ জন্যেই তো যাইনে মা। বাবা ব্যস্তবাগীশ মানুষ, দশটা না বাজতে গিয়ে অফিস আগলে বসেন। আর পৌনে-এগারোটার আগে আমাদের দরজাই খোলে না। নামিয়ে দিয়ে অরুণবাবু তো হাওয়া—পুরো একঘণ্টা সময় হা-পিত্যেশ আমি পথে দাঁড়িয়ে কাটাব?

কথা শোন! জোয়ান ছোঁড়া-ছুড়ি—সে ওঁকে পথে ছুঁড়ে দিয়ে চলে যাবে, একা একা উনি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। গা জ্বালা করে শুনে। কলকাতা শহরে যেন বসবার জায়গা নেই—পার্ক-টার্ক সমস্ত জ্বলেপুড়ে গেছে। শিক্ষিত সুদর্শন ছেলে, চাকরিও নির্ঘাৎ এইবারে—এতেও বুঝি মন উঠছে না। ফিল্মি-অ্যাকটর চাই বুঝি, না ক্রিকেট-খেলুড়ে? পেটের মেয়েকে কত আর স্পষ্ট করে বলি!

ধৈর্য হারিয়ে ক্ষেপে গেলেন একেবারে: এত মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, তোমার ভাগ্যে একটা বর জোটে না। হবে কি করে? যা দিনকাল—সন্দেশ-রসগোল্লা আজকাল কেউ মুখে তুলে ধরে না, খুঁজে পেতে লড়ালড়ি করে নিতে হয়। দিনকে-দিন খাটাশের চেহারা হয়ে দাঁড়াচ্ছে—বাপ-মা হয়ে আমরা পর্যন্ত আঁতকে উঠি, বাইরের ছেলে ঘেঁসতে যাবে কোন দুঃখে? এক মেয়ে নোয়া-সিঁদুর ঘুচিয়ে ধিঙ্গি হয়ে বেড়াচ্ছে, তোমার সে অবধিও পৌছুতে হবে না। চিরকাল আইবুড়ো থাকতে হবে।

এমন কটূক্তিতেও পলি রাগ করে না, হাসে।

কাজ হল কিন্তু। পরের দিন থেকে পলি আলাদা যায় না, বাপের সঙ্গে বেরোয়। আসার সময়টা—তার ছুটি আগে হয়ে যায়, একলা চলে আসে। কাশীনাথ নেমে অফিসে ঢুকলেন, পিছনের সিট থেকে পলি অমনি ড্রাইভারের পাশের সিটে চলে আসে। হাতে সময় পাক্কা এক ঘণ্টা—এক ঘণ্টা কেন, তার বেশি। সাড়ে-এগারোটায় হাজিরা দিলেও পলির অফিসে কিছু বলে না।

ভাবনাচিন্তা করে সকল দিকে দৃষ্টি রেখে নিখুঁত ব্যূহ-রচনা। দুর্গ বিজয় না হয়ে যায় কোথায় এবারে দেখি।

যথানিয়মে একদিন সন্ধ্যা পাঁচটায় অরুণেন্দু এসে গাড়িতে বার কয়েক হর্ন দিল। দিয়ে অপেক্ষা করছে। ছ'টা বেজে গেল, অফিস খালি, কাশীনাথ বেরোন না। কী না-জানি ব্যাপার—ভিতরে ঢুকে

অরুণেন্দু উঁকিঝুঁকি দেয়।

অত বড় হলঘরের মধ্যে একজন মাত্র মানুষ, কাশীনাথ—টাইপরাইটার নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। নিবিষ্ট করে এক একটা চাবি টিপে কিছু টাইপ করলেন, তার পরে বিরক্তভাবে কাগজটা গুটিয়ে দলা পাকিয়ে বাস্কেটে ছুঁড়ে নতুন কাগজ নিয়ে আবার লেগে যান। পরিণামে তারও ঐ এক দশা।

অরুণেন্দু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুর্দশা দেখল ক্ষণকাল। তারপর সাড়া দেয়ঃ এসে গেছি স্যার। এইবারে তো বাড়ি যাবেন?

যাব তো বটেই। বিষম মুশকিলে পড়ে গেছি—

বিপন্ন স্বরে কাশীনাথ বলছেন, স্টেনো আজ তিন দিন আসে না অথচ কয়েকটা চিঠি না ছাড়লেই নয়। কখন থেকে চেষ্টা করছি, হয় না। ছিঁড়ে ছিঁড়ে গাদা হয়ে গেল।

অরুণেন্দু সবিনয়ে বলে, আমি চেষ্টা করে দেখব স্যার? প্রা[illegible] নেই, ভুল আমারও নিশ্চয় হবে।

হাঁপিয়ে পড়েছিলেন কাশীনাথ, প্রাণে জল এলো। টাইপরা[illegible] ছেড়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। দু-মিনিটে চিঠিখানা [illegible] করে অরুণেন্দু তাঁর হাতে এনে দিল।

মুগ্ধ বিস্ময়ে কাশীনাথ বলেন, বাঃ বাঃ, ভুল হবে বলে যে বি[illegible]য় করছিলে। টাইপের পাকা হাত তোমার। নিখুঁত হয়েছে।

একটা হয়ে গেল তো কাগজ নিয়ে তাড়াতাড়ি দ্বি[illegible]টা মুশাবিদা করছেন। বলেন, চিঠি আরও কয়েকটা আছে। [illegible]ছ চেয়ারে তো উঠে পোড়ো না, শেষ করে যাও।

অরুণেন্দু বলে, কাগজে-কলমে লিখতে হবে কেন। [illegible]শন দিন, নোট নিয়ে নিই। তাড়াতাড়ি হবে।

কাশীনাথ সবিস্ময়ে বললেন, সর্টহ্যাণ্ডও জানো? ওরে [illegible]বা সবগুলো গুণ কবজা করে বসে আছ—তোমার চাকরি ঠেকা[illegible]ক!

গুণ দেখিয়ে চাকরি হয় না স্যার। বৃথাই খেটে মরেছি [illegible]টে খেটে গুণ বাড়িয়ে গেছি।

মুষড়ে পড়ো কেন ?

ম্লান হেসে অরুণেন্দু বলে, চার বছর ধরে অফিসে অফিসে ঘুরে মরছি—

কাশীনাথ বলেন, আজেবাজে অফিসে ঘুরেছ, যারা গুণের কদর বোঝে সেই সব অফিস বাদ দিয়ে।

তার পর চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে জোর দিয়ে বলেন, আচ্ছা, এইবারে দেখা যাবে। চাকরি না হয়ে দেখি যায় কোথায়।

দুটো চিঠির ডিকটেশন শেষ করে তৃতীয়টা বলতে যাচ্ছেন— অরুণেন্দু বলে, এই অবধি থাকলে হত। যাবে তো কালকের ডাকে —অফিস-টাইমে কাল এসে টাইপ করতে পারি।

মার্জনা চাওয়ার ভঙ্গিতে আবার বলে, শেষ করে দিলে অবশ্য ... মিটত, আপনার উদ্বেগ দূর হত। কিন্তু একটা দোকানে ... তা লিখে কিছু কিছু পাই। বিকালের টুইশানি ছেড়েছি, তারপর ও ... যদি চলে যায় খরচ চালাতে পারব না স্যার।

কাশীনাথ প্রণিধান করলেন : তা ঠিক। দোকানের কাজটা ছেড়ো না, চাকরি সম্পূর্ণ হাতে না আসা পর্যন্ত চালিয়ে যাও। দশটায় কাল পলিকে পৌঁছে দিয়েই অমনি টাইপরাইটারে এসে বসবে—কেমন ? যাওয়া যাক তবে।

বাড়িতে সুবাসিনী মুকিয়ে আছেন : পোলাও'র মিহিচাল চাট্টি ... করে দাও দিকি বাবা। ছোটভাই আমার বম্বে থাকে, হপ্তাখানেকের জন্য এসেছে। তাকে একদিন খেতে বলব—তা সাদা ভাত কেমন করে পাতে বেড়ে দিই। বেশি নয়, কিলোখানেক হলেই হয়ে যাবে।

অরুণেন্দু একটুও দ্বিধা না করে ঘাড় কাত করল : হবে—

এক মুখ হেসে সুবাসিনী বললেন, কর্তা বলছিলেন, চালের অভাবে লোকে কচু-ঘেচু খেয়ে মরছে, তোমার আবার এমনি চাল নয় মিহিচালের ফরমাস। তখন জাঁক করেছিলাম : অরুণ আছে। সোনার-চাঁদ ছেলে আমার—দেখে নিও তুমি। চালটা যেন সরেস

হয় বাবা, কর্তার কাছে যাতে মুখ থাকে।

অরুণ বলল, আসল দেরাদুন-রাইস। নিয়ে আসব কাল, দেখে নেবেন।

ফাইফরমাস খাটতে ছেলেটার জুড়ি নেই। আর যেমন দিনকাল —এটা নেই, ওটা নেই, ফরমাস একটা-না-একটা লেগেই আছে।

সুবাসিনী বললেন, ভাল তপসেমাছ আজকাল তো বাজারে দেখিনে। পাওয়া যায়? ভাই আমার তপসেমাছ-ভাজা বড় পছন্দ করে। বম্বে ও-জিনিস মেলে না।

অরুণেন্দু কল্পতরু। বলল, পাবেন।

আর সন্দেশ? সন্দেশ তো বন্ধ। মুখ-পোড়া মন্ত্রীদের যা দু-চোখে পড়ে, বন্ধ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে কালোবাজারে ঢোকে—

আর ঢোকে মন্ত্রীদের বাড়ির ফ্রিজে। খেয়ে-খেয়ে ঐরাবত হল এক-একটা। পাবেন না সন্দেশ—নয়তো শেষ-পাতে কি দেবেন? লাড্ডু খেলে তো মুখ বিস্বাদ হয়ে যায়, পুরো খাওয়াটাই মাটি।

ফাইফরমাস এমনি হরবখত লেগে আছে। আর মুখ দিয়ে প্রকাশ পেলেই হল—মাল ঠিক এসে পড়বে দু-দশ ঘণ্টা বা দু-দশ দিনের মধ্যে। এলো না, এমন কদাচিৎ ঘটেছে।

সুবাসিনী পুলকে গদ-গদ হয়ে বলেন, আমরা তো মাথা খুঁড়েও কোন-একটা বের করতে পারি নে। তাল-বেতাল আছে নিশ্চয় তোমার তাঁবে। হুকুম মাত্রেই তারা জুটিয়ে এনে দেয়।

তাই বটে! তাল ও বেতাল—জয়ন্ত আর চাঁদমোহন। সুখ-দুঃখের নিত্যসাথী। ধুস, দুঃখের পাশাপাশি সুখের কথা কেন আবার! সুখ বলে কিছু নেই, নিতান্তই ওটা কল্পনার জিনিস। কবে কে সুখ পেয়েছে? অন্তত অরুণ তো এতখানি বয়সের মধ্যে একবার তরে পায় নি। জয়ন্ত-চাঁদমোহনও বিস্তর দুঃখধান্ধা করে—দুই ও-দুটির সঙ্গে অরুণেন্দুকে এক-জোয়ালে জুড়েছে।

গোলদারি দোকানে সর্বেসর্বা জয়ন্ত। সাদাবাজারে শুধু একটা

ঠাট রেখে সে-দোকানের আসল কাজকর্ম কালোবাজারে। আর চাঁদ-কেবিন চালিয়ে চালিয়ে চাঁদমোহন খাদ্য ব্যাপারে ঘুঘু হয়ে গেছে—ভালো-জিনিষ ভেজাল-জিনিস কোনটা কোথায়, নখদর্পণে রয়েছে তার। অরুণকে ওরা ঢালাও বলে দিয়েছে, তাক করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিস তো সর্বদিক দিয়ে মোক্ষম-সাক্ষম করে ধর, ছিদ্র রাখবি নে। খেয়ে না-খেয়ে একগাদা পাশের সার্টিফিকেট জমিয়েছিস, কর্তাকে পটা সেইগুলো দিয়ে। কন্দর্পের মতন চেহারা একখানা রয়েছে—তার সঙ্গে কিছু মিঠে-মিঠে বচন মিশিয়ে মেয়েটাকে ওদিকে পটিয়ে ফেল। আর গিন্নি পটানোর ব্যাপারে আমরা দু-জন রইলাম—চাকরি যদ্দিন না পাকাপাকি হচ্ছে, বাঘের-দুধ চাইলেও চিড়িয়াখানায় ঢুকে দুয়ে এনে দেবো। ভাবিস নে।

পুলকিত কণ্ঠে গিন্নি তাই বলছেন, এত সব জিনিস কোথায় পাও বলো তো? অবাক লাগে।

অরুণেন্দু হেসে দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল, সবই মা একেবারে হাতের গোড়ায় রয়েছে। স্বর্ণপ্রসবিনী আমাদের রাজ্য, কোন-কিছুর অভাব নেই। সরকারি হুকুম শুনে মুচকি হেসে তারা একটু গা-ঢাকা দিয়ে আছে এইমাত্র। তাতে কারো অসুবিধে নেই, মোকামের হদিস সবাই জানে। দুটি-চারটি সাধুসজ্জন আছেন, আঙুলে গোণা যায়—তাঁরাই কেবল জানেন না। সরকারি কর্তারা ভালো মতন জানেন। নিজেদের তিলেক-মাত্র অসুবিধা নেই—জেনেবুঝেই এত সব কড়া-কড়া হুকুম।

কাজকর্ম নিয়মদস্তুর চলছে। দশটার মিনিট দশেক আগে ম্যাথুস এণ্ড হেণ্ডারসনের সামনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। তখন অবধি তিন জন গাড়িতে। সামনের দিকে স্টিয়ারিং-চক্র ধারণ করে অরুণেন্দু—পিছনের সিটে বাপ আর মেয়ে। পলি অরুণে এই ক'দিনে যৎসামান্য মুখ-চেনা হয়েছে, এই গোছের একটা ভাব। কথাবার্তা

উভয়ের মধ্যে বড়-একটা হয় না—প্রয়োজনে নিতান্তই যদি বলা হয়, অতিশয় সংক্ষেপে যথোচিত সম্ভ্রম সহকারে 'আপনি' 'আপনি' করে।

কাশীনাথ যতক্ষণ গাড়িতে থাকেন, অবস্থা এই প্রকার। গাড়ি থেকে নেমে তিনি অফিসের ভিতরে ঢুকে গেলেন—চকিতে পট-পরিবর্তন। পিছনের সিট ছেড়ে পলি ড্রাইভারের পাশে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে, গাড়িও এতক্ষণ দেখে-শুনে অতিশয় ধীরগতিতে চলে এসেছে, কর্তা নেমে যেতে পাখা মেলল এইবারে যেন। চলছে না আর, উড়ছে। লহমায় রেডরোডে এসে পড়ে। কাল থেকে আজ এত বেলা অবধি পলি একগাদা কথা আর হাসিতে বুক বোঝাই করে গলার নলিতে ছিপি এঁটে রেখেছিল, ছিপি খুলে দিল ময়দানের পথে এসে—কলকল করে অঝোর ধারায় এবারে বেরুচ্ছে। আপনি-টাপনিগুলোও ছুঁড়ে দিয়ে হাল্কা হয়েছে, ঘরে এসে ভদ্র পোশাক ছেড়ে ফেলার মতো।

তারপরে আর এক দফা জায়গা বদলাবদলি। পলি ড্রাইভারের জায়গায় আর অরুণ গা-ঘেঁষে একেবারে তার পাশটিতে। ড্রাইভিং শেখে পলি, অরুণ শেখাচ্ছে—এ জিনিস আলগোছে দূরে-দূরে বসে হয় না, গা ঘেঁসে হাতে ধরে শেখাতে হয়।

অরুণ সাহস দিয়ে বলে, গাড়ি চালানো খুব সোজা। আমার মোটে এক হপ্তা লেগেছিল।

পলি বলে, ড্রাইভার না রাখতে হলে গাড়ির খরচাও এমন-কিছু নয়।

ও হরি, গাড়ি রাখার বাসনা নাকি তোমার?

পলি বলে, তুমি চালাতে পারো, আমিও পারব—খরচা শুধু পেট্রোলের। অফিসে আমার যাওয়া-আসা তোমার যাওয়া-আসা —সেদিকটাও দেখ হিসেব করে। আর বাসে তো রড ধরে বাদুড়-ঝোলা হয়ে নিত্যিদিন প্রাণ হাতে করে যাওয়া—মাগো মা, আমি তো ছটফট করে মরব যতক্ষণ তুমি ফিরে না আসছ।

পলির উদ্বেগে অরুণের কৌতুক লাগে। ঘরকন্না এরই মধ্যে

শুরু হয়ে গেছে যেন। বলে, সব যেন হল। কিন্তু সকলের আগে গাড়ি একটা তো কিনতে হবে। একসঙ্গে এক কাঁড়ি টাকা লাগবে, তাব হিসাবটা ভেবেছ?

পুরানো গাড়ি কিনব বাবার মতন—

হাত নেড়ে সমস্যা পলি একেবারে উড়িয়ে দেয়ঃ এদ্দিন চাকরি হল, ঘাস কেটেছি নাকি বসে-বসে? সেভিংসব্যাঙ্কে রয়েছে। যেটুকু কম পড়বে, অফিস থেকে ধার নিয়ে নেবো। অফিসও তো দুটো—আমার অফিস, তোমার অফিস। দায় জানিয়ে দু-জায়গা থেকে ভাগাভাগি করে ধার নেবো।

অরুণ বলল, চাকরি আমার হয়েই গেছে ধরে নিচ্ছ।

নিচ্ছিই তো। দু-জনের অফিস যাতায়াত বলেই না গাড়ি। আমার একার হলে কী দরকার? বিনি গাড়িতেই বরাবর তো চালিয়ে এসেছি।

এগারোটা বাজে, রোদ প্রখর। ময়দান ছেড়ে গাড়ি আবার অফিস-পাড়ায় এসেছে। পলি যথাপূর্ব পিছনের সিটে। এবং অরুণেন্দুও ড্রাইভার বই আর কিছু নয়।

পলি নেমে পড়ে একটুখানি আজ অরুণের কাছে দাঁড়াল। ঢোঁক গিলে বলল, বাবা পই-পই করে মানা করেছেন কাউকে যেন না বলি। চেপেচুপে আছিও এতক্ষণ। না, তোমায় না বলে পারা যাবে না। চাউর না-হয় দেখো।

অরুণ উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে পড়ল। বুক ধড়াস-ধড়াস করছে।

পলি বলে, গঙ্গাধর মুখুজ্জের জায়গায় লোক না নিলে আর চলছে না, বাবা তো জরুরি নোট দিয়ে আসছেন। সিনিয়র ডিরেকটর এদ্দিনে ঢালাও হুকুম দিয়েছেন বাবাকে। জিনিসটা বাবা চেপে রেখেছেন—কাউকে জানতে দেন নি। মায়ের কাছে বলছিলেন, আমি শুনে নিয়েছি।

চুপ করল পলি। বলবে কি বলবে না, ইতস্তত করছে বোধহয়। অধীর হয়ে অরুণ বলল, বলো না—

পলি বলে, সুখবর। সমস্ত ভার বাবার উপরে। বলেছেন, তোমার সেকসন, কাজকর্মের জন্য তুমি সম্পূর্ণ দায়ী। তোমার পছন্দ মতো একজনকে নিয়ে নাও, তার মধ্যে আমি নাক গলাতে যাব না। বাজে লোক হলে তখন দুষব।

হেসে বলে, সেই লোক বুঝতেই পারছ তুমি ছাড়া কেউ নয়। অন্য কেউ হতে পারে না। দু-জনের অফিস যাওয়া, গাড়ি কেনা, এত সব বলছিলাম—কোনদিন বলি নে, আজ কেন বলছি, পাগলামি কেন করছি—বোঝ তবে এইবারে।

যেতে গিয়েও আবার সতর্ক করে ঃ কাউকে বলবে না, খবরদার! তোমার জয়ন্ত চাঁদমোহন বন্ধুদেরও না। জানাজানি হয়ে গেলে অনুরোধ-উপরোধের অন্ত থাকবে না। নানান রকমের বাগড়া আসবে। তাক বুঝে টিপি-টিপি বাবা তোমায় নিয়ে ফেলবেন। নেওয়া হয়ে গেলে তখন আর কি! তোমার লোক আছে, আগে তো বলোনি ভাই—এমনি সব বলে কাটান দিয়ে দেবেন। মায়ের সঙ্গে বলছিলেন বাবা। জিনিসটা একেবারে উনি চেপে গিয়েছেন।

পলির মুখে কয়েকটা দিন পরে আবার এক সুখবর ঃ একটা ফ্ল্যাট পেয়ে যাচ্ছ যে তুমি। ভাল হয়েছে, তাই না? বিয়ের পরে বাপের-বাড়ি কেন পড়ে থাকব? আমি চাইলেও চাকরে-জামাই তুমি কেন তা হতে দেবে? অ্যালটমেণ্ট দু-হপ্তা পরে। দখল নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চেপে পড়বে, ফেলে রাখা চলবে না। দিন-কাল বড্ড খারাপ, বেহাত হবার ভয় আছে।

বোকা-বোকা মুখ করে অরুণেন্দু নিরুত্তাপ স্বরে বলল, চাকরি-পাওয়া বিয়ে-করা হয়ে যাচ্ছে সব দু-হপ্তার মধ্যে?

ঠাট্টা কিসের! দু-হপ্তার মধ্যে না হোক, দু-মাসে হবে। নিশ্চয়

হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফ্ল্যাট জোটানোও কম কঠিন নয় জেনো, চাকরি জোটানোর কাছাকাছি।

পলি টিপে-টিপে হাসে। বলে, এক ক্রিমিন্যাল কাণ্ড করে বসেছি। ইচ্ছে করলে আমায় জেলে দিতে পার। তোমার নাম জাল করেছি।

অরুণেন্দু শঙ্কিত হল। পলি ঘোরতর প্রেমে পড়েছে—'সখি আমায় ধরো-ধরো' অবস্থা। প্রেমের ধাক্কায় সব কিছু সম্ভব। জাল-জালিয়াতি সামান্য কথা, প্রেমোন্মাদ হয়ে লোকে হক না-হক মানুষ-খুন করে ফেলে।

কী করেছ, খুলে বলো।

ইমপ্রুভমেন্ট-ট্রাস্ট কয়েকটা তৈরি-ফ্ল্যাট সস্তায় বিলি করছে। তুমি রাজি হও না-হও—ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে তোমার হয়ে আমিই দিলাম দরখাস্ত ছেড়ে। বিনি তদ্বিরে কিছু হয় না—এদ্দিনের চাকরি এখানে, কাকে ধরলে কী হয় তত্ত্বটা আমার ভালমতো জানা। উঠে পড়ে লেগে গেলাম। শ-সাতেক দরখাস্ত পড়েছিল, তবু হয়ে গেল তোমার একটা। তদ্বিরের জোরে।

অরুণ প্রশ্ন করে: আমার নাম জাল না করে দরখাস্ত নিজের নামে দিলে না কেন?

হত না। আমাদের বড়কর্তাটি এ বাবদে বড় নারাজ। বদনাম রটবে, ঘরে ঘরে নিয়ে নিচ্ছে তো বিজ্ঞাপন দিয়ে পাবলিককে ডাকে কেন? তা সে একই কথা—দরকার পড়লে বেনামিতে নিয়ে নেয়। আমার বেলা যেমনটা হল।

গাড়ি রেখে ময়দানের গাছতলায় পা ছড়িয়ে বসেছে সেদিন। ভ্যানিটিব্যাগ খুলে পলি লম্বা একটা কাগজ বের করল: বাসার জন্যে কিছু ফার্নিচার আর আপাতত যা-সব লাগবে, লিস্টি করেছি দেখ। আরও কিছু মনে পড়ে তো ঢুকিয়ে দাও।

চমক খেয়ে অরুণ বলে, এত ?

একটা সংসার গোড়া থেকে গুছিয়ে তুলতে কম জিনিষ লাগে ! তবু তো কত বাকি রয়ে গেছে, দরকারে মনে পড়বে।

বিস্তর টাকার ধাক্কা যে !

পলি খিলখিল করে হাসে : টাকা লাগবে, তোমার কি তাতে ? মোটামুটি দামের হিসাবও করেছি। সেভিংসব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে তোমার কাছে রেখে দেবো। এখন তোমার উমেদারির ঝামেলা নেই, অফিস যাওয়াও শুরু হয় নি—হাতে অঢেল সময়। ধীরে-সুস্থে দেখেশুনে কেনাকাটা করতে থাকো। ফাঁক পেলে আমিও জুটে যাবো তোমার সঙ্গে।

উঃ, সেভিংসব্যাঙ্কে কত টাকা তোমার ! সেদিন গাড়ির কথা হল, আজকে বাড়ি।

পলি বলল, গাড়ি থাক আপাতত। দু-জনের রোজগার হতে থাকলে বাবার মতন ঐ রকম একটা গাড়ি কেনা শক্তটা কি ! বাড়িটা বেশি জরুরি। ফ্ল্যাট যখন পেয়ে গেলাম, বিয়ের পরে একটা দিনও আমি বাপের-বাড়ি থাকব না। সাজানো-গোছানো কেনাকাটা সমস্ত সেরে নাও এর মধ্যে।

অনেক দিন পরে অরুণ ভূপেন স্যরকে দেখল। হরিহর স্যরের ছেলে ভূপেন। হিন্দু হস্টেলে থেকে প্রেসিডেন্সিতে পড়ত। যার দৃষ্টান্তে পূর্ণেন্দুর মাথায় দুর্বুদ্ধি এসেছিল—অভাব-অনটনের সংসারে নিজেদের আরও বেশি করে বঞ্চিত করে ভাইকে প্রেসিডেন্সিতে পাঠাল। পাশ করে দিগ্‌গজ হয়ে আসবে ভাই, সুখ-সম্পত্তির অন্ত থাকবে না।

পাশ তো করেছি দাদা—কই, ধামা-ঝুড়ি-বস্তা নিয়ে চলে এসো, ধামা ধামা সুখ আর বস্তা বস্তা সম্পত্তি বাড়ি নিয়ে যাও।

ভূপেন উপরের ক্লাসে পড়ত। সেকেণ্ডইয়ারে পড়াশুনো ছেড়ে

কোথায় যেন চাকরি নিয়েছিল। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আবার কলেজে ঢুকল। অরুণের সঙ্গে এক ক্লাসে এবার। সেই ভূপেন দশটা বেলায় ম্যাথুস এণ্ড হেণ্ডারসন অফিসের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। কাশীনাথ গাড়ি থেকে নামলেন, তাঁর পিছু পিছু ভূপেনও ভিতরে ঢুকে গেল।

বাপ নেমে যাওয়া মাত্র পলি যথারীতি সামনের সিটে। অরুণের কী হল যেন হঠাৎ—স্টিয়ারিং-চাকায় হাত রেখে ঝিম হয়ে আছে।

পলি বলে, কী হল তোমার ?

অস্ফুট জড়িত কণ্ঠে অরুণেন্দু বলল, ভূপি—

পলি ব্যস্ত হয়ে বলে, ভূপি কে ?

স্যারের সঙ্গে ঐ যে ঢুকে গেল। অদ্ভুত ঘড়েল। একই বছরে এক ঘরে দু-জনে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বসেছিলাম। আমার খাতা হুবহু টুকে ভূপি তিনটে লেটার পেলো, আমি টায়েটোয়ে পাশ।

পড়াশুনোর ধার ধারত না ভূপেন। বলত, পণ্ডশ্রম। পাশ করব, তার জন্য পড়তে হবে কেন ? সত্যিই নিষ্প্রয়োজন, হাতে-হাতে দেখিয়ে দিল সে। ঈশ্বর-দত্ত অলৌকিক ক্ষমতা ধরে সে, নইলে এমন কাণ্ড কদাপি সম্ভব নয়। অরুণ আর ভূপির একই ঘরে সিট পড়েছে। অরুণের খাতার দিকে ভূপি একদৃষ্টে তাকিয়ে। অরুণ লিখছে তো ভূপিরও কলম চলছে, অরুণ থামল তো ভূপির কলমও থেমে যায়। লিখছে খাতার পাতে কিন্তু ভুলেও সেদিকে তাকায় না, দৃষ্টি সর্বক্ষণ অরুণেন্দুর কলম চলাচলের দিকে।

পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে অরুণ জিজ্ঞাসা করেঃ আমার খাতায় একনজরে কি দেখছিলি ?

ভূপি বলে, অদ্দূর থেকে খাতার কিছু কি দেখা যায় ? দেখছিলাম কলম। কলমের নড়াচড়া দেখে কী লেখা হচ্ছে ধরা যায়। নার্সারি-ইস্কুলে দিদিমণি লিখে দেয় বাচ্চারা তার উপর দাগা বুলোয়, অবিকল

সেই জিনিস। কী লিখে এলাম জানিনে—তুই যা যা লিখেছিস, হুবহু তাই। একটি কথার হেরফের নেই।

পরীক্ষার ফল বেরুলে অরুণেন্দু জিজ্ঞাসা করেছিল: আমার লেখা টুকেছিলি তো টপকে গেলি আমায় কেমন করে?

তোর লেখা পুরোটাই ছিল, আর বাড়তি ছিল আমার তদ্বির। একজামিনার হেড-একজামিনার ট্যাবুলেটর—হেলাফেলা কাউকে করিনি। তুই এসব করতে যাস নি, সেদিক দিয়ে ওজন আমার ভারী হয়ে দাঁড়াল।

তদ্বিরে অদ্বিতীয়। সেই ছাত্রকাল থেকেই। পাঁচ পাঁচটা বছর ধরে কলকাতা শহর চষে ফেলেও অরুণ একটা চাকরি জোটাতে পারে না, আর ভূপির যেন লোফালুফি চাকরি নিয়ে। আজ এ চাকরিটা ধরল, কাল ছাড়ল, পরশু ধরল নতুন-একটা—এর তার কাছে বলে বেড়ায়, অরুণের কানে আসে। ষোলআনা সত্যি কখনো নয়, রং চড়িয়ে ছাড়া ভূপি বলতে পারে না। তবু খোসা-ভুষি বাদ দিয়ে সারবস্তু নিশ্চিত কিছু আছে।

এ হেন ভূপি শুধুমাত্র অফিসে নয়, কাশীনাথ বাড়ি ফিরলে রাত্রে সেই বাড়ি অবধি গিয়ে হাজির হয়েছিল। নিভৃতে চুপিচুপি কথাবার্তা। অর্থাৎ চাকরি কাশীনাথের কথায় হবে, অতিগুহ্য খবরটা তার অবিদিত নেই।

লোকটাকে দেখেই পলি জানলায় কান পেতেছে। কথাবার্তা সমস্ত শুনে পরের দিন অরুণেন্দুকে বলল: ঠিক ধরেছিলে, গঙ্গাধর মুখুজ্জের চাকরিটার জন্যই বটে। এক বছরের পুরো মাইনে হিসেব করে বাবার হাতে অগ্রিম গুঁজে দিতে চায়। আবার বলে কি জানো—

অরুণ বলল, কলেজের বন্ধু আমার। আবার এক জায়গার মানুষও বটে। চলন দেখেই ওর মনের কথা ধরতে পারি।

পলি বলে, ঘুঘুলোক একটি। ঘুষের কথাবার্তা কেমন অবলীলাক্রমে বলে গেল। বলে, পারচেজিং কাজকর্ম রয়েছে, আর

আপনার মতন মানুষ মাথার উপর রইলেন—অগ্রিম যা দিচ্ছি, ওটা আমি ছ-মাস একবছরের ভিতর তুলে নিতে পারব। তারপর থেকে যত-কিছু উপরি তার একটা বাঁধা পারসেণ্টেজ আপনার। মাসে মাসে ঠিক নিয়মে পেয়ে যাবেন।

অরুণেন্দুর মুখ যেন ঈষৎ পাংশু। তাকিয়ে দেখে পলি গর্জন করে উঠল : নিন না বাবা একটি পয়সা ঐ লোকের হাত থেকে। কত বড় ঘুষখোর উনি, দেখে নেবো। ধরিয়ে দিয়ে ওঁর চাকরি খাবো, বাবা বলে রেহাই করব না।

সে সবের প্রয়োজন হয় নি। কাশীনাথের উপর মিথ্যে দোষারোপ, লোকে প্রস্তাব দিলে তিনি কি করতে পারেন? পলি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। তড়পানিটাও খুব যে গোপন আছে, তা নয়। বড়বোন ডলির কাছে বলেছিল—বলে মানা করে দিয়েছে, বাবার কানে না যায়। ডলি অতএব সঙ্গে সঙ্গেই কানে তুলেছে, সন্দেহ নেই। ডলির এই স্বভাব : কথা কাঁটার মতন পেটের মধ্যে ফুটতে থাকে, ছাড় করে না দেওয়া অবধি সোয়াস্তি নেই। বিশেষ করে কথাটা গোপন রাখবার অনুরোধ আসে যদি।

ভূপেন স্বরকে কাশীনাথ আমল দেন নি, সাচ্চা সাধুলোক হয়ে হাঁকিয়ে দিয়েছেন। পলির রাগারাগি ও ভয় দেখানো একটা কারণ, সন্দেহ নেই। আবার, এত দিনে পলির বর জুটে যাচ্ছে, সে-ও এক বিবেচনার বিষয় বটে। অরুণেন্দুকে ডেকে খোলাখুলি বললেন, চাকরি তোমার হবেই। চাউর করো না কথাটা—সিনিয়র ডিরেকটর আমার উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়েছেন। মৌখিক বলে তিনি বাইরে চলে গেছেন। ভেবেচিন্তে দেখলাম, নিয়মদস্তুর লিখিত-অর্ডার থাকাই ভাল। নানা জনের স্বার্থে ঘা পড়বে, নানান রকম প্যাঁচ খেলবে—দরকারে যাতে হাতে-হাতে পাকা-দলিল দেখাতে পারি। বড়সাহেব সামনের মাসে ফিরবেন, খবর এসে গেছে। এদ্দিন কেটেছে তো আর এই একটা মাস। নির্ভাবনায় থাকো বাবা, চাকরি তুমি পেয়েই গেছ ধরে নিতে পার।

খুঁজে পেতে কাশীনাথ গাড়ির জন্য নতুন ড্রাইভার জুটিয়ে আনলেন। অরুণেন্দুকে বলেন, গাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছ ফেরত নিয়ে আসছ, এতে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পায়। শত্রুরা কথা তুলতে পারে। যা হয়েছে হয়েছে—আর কাজ নেই। এই এক মাস তুমি গা-ঢাকা দিয়ে থাক, অফিস মুখোই হবে না। চাকরিটা গেঁথে যাক—তখন আর পরোয়া কিসের? তুমি আর আমি এক গাড়িতে যাওয়া-আসা করব।

ভাবী অফিস-এসিস্টাণ্ট বিশেষ করে ভাবী জামাইকে দিয়ে গাড়ি চালানো যায় না। নতুন ড্রাইভার এনে অরুণকে রেহাই দেওয়া হল অতএব। চাকরির দরখাস্ত লেখা এবং উমেদারির ঘোরাঘুরিও বন্ধ।

বিনি কাজে অরুণেন্দুর দিন আর কাটতে চায় না—

কী করি বলো তো?

পলি বলল, কাজের অভাব কি? ফ্লাট পেয়ে যাচ্ছ, সাজাও-গোছাও মনের মতন করে।

নিচের তলায় ছিমছাম ছোট ফ্লাট। মাঝারি বেডরুম দুটো, বাড়তি আরও আধখানা ঘর—বৈঠকখানার কাজ চলবে। তা ছাড়া রান্নাঘর ইত্যাদি।

নতুন ফ্লাট—আনকোরা। প্রথম এই আমরা ঢুকছি। আসবাব-পত্তোর কিছু তো নেই, সমস্ত কিনতে হবে—খাট আলমারি থেকে ঝুল-ঝাড়া জুতোর-কালি অবধি। ঝঞ্ঝাট একটু-আধটু নয়—হাত লাগাও, বুঝতে পারবে। ফর্দ করে নিয়ে ধীরে-সুস্থে কেনা-কাটায় লেগে যাও। অফিসে বেরুনো শুরু হয়ে গেলে তখন আর সময় পাবে না।

প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা পলি অফিস-ফেরত নতুন ফ্লাটে চলে আসে। খাট আলমারি ড্রেসিংটেবল আলনা চেয়ার কোনটা কোথায় বসবে শলাপরামর্শ হয়—এ-ঘরে না ও-ঘরে এ-পাশে না ও-পাশে, তর্কাতর্কিও হয় ঘোরতর। এক এক দিন কাজের কথা কিছু নয়—

গল্প, আজেবাজে গল্প দু-জনে মুখোমুখি বসে।

পলি বলে, বাসনকোশন কিনতে যেও না তুমি। পুরুষে পারে না। রান্নাঘর আমার—সুবিধা-অসুবিধা বুঝে আমি পছন্দ করে কিনব।

খাওয়াদাওয়া আগের মতো চাঁদ-কেবিনে চলছে। দরজায় তালা দিয়ে দু-জনে বেরিয়ে পড়ে। ছোট্ট একটা পার্কের মতন আছে—একটা বেঞ্চি দখল করে বসল বা কোন দিন। তারপর পলি বাড়ি চলল, অরুণেন্দু চাঁদ-কেবিনের পুরানো আড্ডায়। অনেক রাত্রে ফ্লাটে গিয়ে শুয়ে পড়বে।

একদিন অরুণ বলল, ফ্লাটে একলা একজন পড়ে থাকি, নিশিরাত্রে ঘুম ভেঙে কেমন যেন গা ছমছম করে।

পলি তরল কণ্ঠে বলে, ভূতের ভয়?

আমিই ভূত হয়ে গেছি কি না, সেই ভয়। দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে একলা হয়ে গেছি যেন হঠাৎ। মরার পরে এমনিটাই বুঝি ঘটে!

এত সাধ-আহ্লাদের মধ্যে খামোকা মরাছাড়ার কথা পলির ভাল লাগে না। কথা ঘুরিয়ে নেয়ঃ ছ-ছ'টা মানুষ এদ্দিন এক বিছানায় শুয়ে এসেছ কিনা—

অরুণেন্দু হেসে বলে, বিছানা মানে ফুটো শতরঞ্চি আর ছেঁড়া মাদুর। দস্তুরমতো হিসেব-নিকেশ করে তার উপরে শোওয়া—কতক কাত হয়ে শোবে, কতক চিত হয়ে। একসঙ্গে সবাই চিত হতে গেলে জায়গায় কুলোবে না।

পলি বলে, খেয়ে আসবার সময় ওদেরই একটি দুটি সঙ্গে আনলে তো পারো।

ঐ সুখ ছেড়ে আসবে কেন তারা? বয়ে গেছে!

কী করব বলো, আমি তো আসতে পারিনে—

নিশ্বাস ফেলে পলি বলল, নোটিশ দেওয়া রয়েছে—সাক্ষি সঙ্গে নিয়ে রেজিস্ট্রারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে লহমার মধ্যে হয়ে যায়।

কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট-লেটার হাতের মুঠোয় আগে চাই, ধনুক-ভাঙা পণ যে তোমার। দোষ দিইনে—দায়িত্বে ঢোকবার সময়ে আগু-পিছু ভাবতে হবে বই কি! ঘুষেলদের বিশ্বাস নেই, নিজের বাপ হলেও না। কন্যাদায় আপোষে যদি কেটে যায়, ঐ বাবাই তখন কী মূর্তি ধরবেন ঠিক কি! তুমি ঠিক করেছ।

পলি প্রস্তাব করে: মাকে নিয়ে এসো ধাপধাড়া সেই পল্লীশ্রী-কলোনি থেকে। দিদিকেও। তাহলে তো একা থাকতে হয় না। বেকার আছ এখনো—বাড়ি চলে যেতে অসুবিধা কিছু নেই।

বর পাচ্ছে পলি—সে একেবারে বর্তে গিয়েছে। পলি হেন আধবুড়ো কুরূপ কনের অদৃষ্টে এম-এ পাশ কন্দর্পকান্তি বর। বেকার বলে খুঁত ছিল, তা-ও খণ্ডে যাচ্ছে অচিরে। বিয়ের পরে বান্ধবীরা অরুণেন্দুকে চর্মচক্ষে দেখবে এবং, আহা রে, কতজনা তাদের মধ্যে হিংসায় বুক ফেটে টিপঢাপ ভূতলে পড়ে যাবে! অরুণের কথা পলি সমস্ত জানে, দিনের পর দিন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছে। যশোদার নামে 'মা' সম্বোধন, মলিনার নামে 'দিদি'—শাশুড়ি ও বড়জাকে যা বলে ডাকার নিয়ম।

পলি বলে, চট করে একদিন চলে যাও, গিয়ে মা-ওঁদের নিয়ে এসো। তোমায় নিয়ে কত সাধআহ্লাদ—ভুল ভেবে মা রাগ করে রয়েছেন।

ম্লান হাসি হেসে অরুণেন্দু বলে, বিস্তর ভালো ভালো কথা বলে এসেছিলাম আমার মাকে, কত রকম আশা দিয়েছিলাম। ভালো একটা বাসা দেখে নিয়ে কলকাতায় আনব, বড়-ডাক্তার দেখাব, গঙ্গায় নাইতে পাঠাব নিত্যিদিন, কালীঘাট-দক্ষিণেশ্বর দেখাব। আরও কত কি বলেছিলাম, মনে পড়ছে না। মানে, সম্রাট-ছেলে হয়ে মায়ের জন্য যা-সমস্ত করা উচিত।

ঝিম হয়ে রইল সে কয়েক সেকেণ্ড। বলে, আজকে ওঁদের দিন চলছে কেমন করে জানিনে। বেঁচে আছেন কিনা, তাই-বা কে বলবে। কুপুত্র স্বার্থপর আত্মসুখী কুলাঙ্গার বলে কড়া কড়া চিঠি

আসত—নিষ্ফল বুঝে তা-ও বন্ধ করে দিয়েছেন। তাতে অন্তত বেঁচে রয়েছেন, খবরটা মিলত। আমিও চিঠি দিইনে। চিঠির চেয়ে টাকার বেশি গরজ—তা যখন সম্ভব হচ্ছে না, চিঠি পাঠিয়ে খামোকা খোঁচাখুঁচি করতে যাই কেন!

পলি বলল, বাড়ি যাও তুমি। পরশু-তরশু নিয়ে এসো।

জোর দিয়ে আবার বলল, বড়-ডাক্তারই দেখানো হবে, গঙ্গাস্নান কালী-দর্শন সমস্ত হবে। মায়ের জন্য এইটুকু যদি না পারি, দু-জনে সারাদিন মুখে রক্ত তুলে খাটতে গেলাম তবে কি জন্যে?

আবদারের সুরে বলে, বিয়ের পরে আমার দিদি শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল—শাশুড়ি-দেওর-ভাসুর জা-জাউলিতে জমজমাট সংসার। শ্বশুরবাড়ি আমারও তো—ফাঁকা ফ্ল্যাটবাড়িতে দেবা আর দেবী, সে আমার মোটেই পছন্দ নয়। নিয়ে এসো, আগেভাগে এসে ওঁরা জমিয়ে থাকুন। আমরা বেশ জোড়ে এসে দাঁড়াব, শাঁখ বাজিয়ে ওঁরা ঘরে তুলবেন।

এমনি সমস্ত কথাবার্তা হয়ে পলি বাড়ি ফিরল। মেয়ের সাড়া পেয়ে কাশীনাথ হাঁক ছাড়লেন: শোন্ রে পলি, শুনে যা! আজকে ভারি এক তাজ্জব খবর।

বড়সাহেবের দেশে ফিরতে এখনো মাসখানেক, অফিসসুদ্ধ জানে। সে মানুষ কাল বিকালে হঠাৎ দমদমায় এসে নামলেন। কাজকর্ম তাড়াতাড়ি সমাধা হয়ে গেছে, ফলাফল উত্তম—মনে খুব স্ফূর্তি। সেই মেজাজের মধ্যে কাশীনাথ অফিসে আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন।

একথা-সেকথার পর: অ্যাসিস্টান্ট নেন নি এখনো? ও, মুখের কথায় হবে না বুঝি, কাগজে-কলমে চাই?

মিনিট পনেরোর ভিতর লিখিত-অর্ডার কাশীনাথের টেবিলে এসে পৌঁছল: অবিলম্বে কাশীনাথ দেখে-শুনে নিজের দায়িত্বে অ্যাসিস্টান্ট

নিয়ে নেবেন।

কাশীনাথ বললেন, হাতে ফরমান—কাকে আর কেয়ার করি! দেরি করব না, কালই অ্যাপয়েন্টমেন্ট। তোকে ডাকলাম পলি, অরুণকে যদি একটা খবর পাঠাতে পারিস—আড়াইটে নাগাত অফিসে গেলে হাতে-হাতে চিঠি দিয়ে দেবো। না গেলেও ক্ষতি নেই অবিশ্যি—পরশুদিন ছুটি, অফিসের পিওন বাসায় দিয়ে আসতে পারবে।

'খবর যদি পাঠাতে পারিস'—কথা শোন বাবার! জুতোজোড়া পায়ে ঢুকিয়ে সেই মুহূর্তে পলি ছুটল। এখন অরুণ চাঁদ-কেবিনে। আড্ডায় মত্ত, অথবা খাওয়ায় বসে গেছে। এত রাত্রে একলা মেয়েছেলের চাঁদ-কেবিন অবধি ধাওয়া করা খানিকটা দুঃসাহসের কাজ বই কি—পাড়াটার মোটেই সুনাম নেই। সকালবেলা ফ্লাটে চলে গেলেই হত।

না, হত না—উল্লাসে পলি আকুলি-বিকুলি করছে, অরুণকে না বলা অবধি বাঁচে কেমন করে!

।। এগারো ।।

সকালবেলা বাইরের-ঘরে কাশীনাথ চায়ের বাটি ও খবরের-কাগজ নিয়ে বসেছেন, অরুণেন্দু এসে হাজির।

এসো, এসো—

তক্তাপোশের উপর ঠিক পাশটিতে কাশীনাথ জায়গা দেখিয়ে দিলেন ঃ বোসো বাবা। ওরে ডলি, আরও এক কাপ চা পাঠিয়ে দে এখানে। অরুণ এসেছে।

জাঁক করে বলে যাচ্ছেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট-লেটার টাইপ হয়ে আছে। ম্যানেজারের সইটা শুধু বাকি। ম্যানেজার মানে মাধু প্রামাণিক। যা-কিছু সমস্ত আজকের মধ্যে হয়ে যাবে। কাল ছুটি—ব্যাঙ্ক-হলিডে। পরশু দিন থেকে গঙ্গাধর মুখুজ্জের চেয়ারে তুমি। পাকা চেয়ার—কোনদিন তার নড়ন-চড়ন নেই। সারা জন্ম এবার থেকে দশটা-পাঁচটা নির্ভাবনায় কলম চালিয়ে যাও।

তরী তা হলে কূলে ভিড়ল, এভারেস্ট-বিজয় সত্যি সত্যি ঘটল তবে! চোখ তুলে অরুণেন্দু দেখল, দরজার ফাঁকে পলি জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে কথাবার্তা তৃপ্তি ভরে যেন পান করে নিচ্ছে। উঠে প্রণাম করল সে কাশীনাথের পায়ে, পায়ের ধুলো নিল।

কাশীনাথ বললেন, অফিসে গিয়ে দেখা কোরো আজ দুটো থেকে তিনটের মধ্যে। জি. এম. থাকবে ঐ সময়টা, সই করে দেবে। কাজের চাপাচাপি না থাকলে কামরায় ডেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট-লেটার নিজ হাতে দিয়ে দেবে। তার মানে নিজেকে জাহির করা—আমার অফিসের চাকরি স্বয়ং আমিই দিচ্ছি, অন্য কেউ নয়। করুগগে তাই, এইটুকুতে খুশি হয় তো হোক। আমাদের হল চাকরি পাওয়া নিয়ে কথা, কি বলো?

কাশীনাথ ফিক করে হাসলেন। হেসে বলেন, একগাদা উপদেশও ছাড়বে হয়তো। হায় রে হায়, মাধু প্রামাণিকও উপদেশ ছাড়ে—শ্রম আর অধ্যবসায়ে নাকি অসাধ্য-সাধন হয়। সাহেবরা চলে যাবার পর কোম্পানিতে লালবাতি জ্বালানোর গতিক হয়েছিল—ঐ দুটি মূলধন, অধ্যবসায় ও শ্রমের ফলেই নাকি ম্যাথুস এণ্ড হেণ্ডারসনের আজ এত উন্নতি। সে উন্নতি নাকি মাধব প্রামাণিকই করেছে। উন্নতি কার দ্বারা হল, সেটা ভাল মতো জানেন আমাদের বড়সাহেব—সিনিয়র ডিরেকটর। শতকণ্ঠে বলেও থাকেন সে কথা। ছোটসাহেব জানলেও মুখ ফুটে কিছু বলবেন না—মাধব প্রামাণিক তাঁর সাক্ষাৎ-শালা। যে রকম বিদ্যেবুদ্ধি—শালা না হলে প্রামাণিক ম্যানেজার হত না, হত ম্যানেজারের আরদালি।

চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। চোঁ-চোঁ করে সরবতের মতো মেরে দিয়ে মুখ মুছে কাশীনাথ আবার বলেন, কার কতদূর এলেম বড়সাহেব বোঝেন সেটা। ঢালাও হুকুম আমার উপরে। বললেন, কোম্পানির লাভ বিক্রির উপরে নয়, কেনাকাটার উপর। পারচেজিং-সেকশনই হল আসল। আপনার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট আপনিই দেখেশুনে বাছাই করে নিন। উপর থেকে আমরা বসিয়ে দিলে এফিসিয়েন্সি নষ্ট হবে। হুকুম হাতে পেয়ে আর দেরি করি তখন! পাঁচটা বেজে গেছে—স্টেনোকে বললাম, ঘড়ি দেখলে হবে না বাপু। যত দেরিই হোক, চিঠি টাইপ করে দিয়ে যেতে হবে। দিয়েছে করে তাই, তবে ছুটি।

অতএব শুভ পয়লা জুলাই থেকে গঙ্গাধর মুখুজ্জের স্থলে নতুন অ্যাসিস্টাণ্ট অরুণেন্দু ভদ্র। কথাবার্তা শেষ করে অরুণ বাড়ির ভিতর ঢুকল। সুখবর এ-বাড়ির, মানুষ কেন, পিঁপড়েটা মাছিটারও বোধহয় জানতে বাকি নেই। কোনদিকে ছিল ডলি, ছুটে এলো। একটা চেয়ার টানতে টানতে বারান্দায় নিয়ে এসে বলে, বোসো ভাই। চাকরির ঝামেলা মিটে গেল, এবারে ঘরসংসার। মনস্থির করে ফেল তাড়াতাড়ি। পলিকে বলেছি, তোমাকেও বলছি। গায়ের রং পলির চাপা বটে—চাপা কেন, কালোই বলছি। কিন্তু

গুণের দিক দিয়ে অমন মেয়ে হয় না।

বাধা দিয়ে অরুণ বলে উঠল, পলি কালো? বলেন কি দিদি, আমি তো জানি নে।

অবাক বিস্ময়ে মুহূর্তকাল সে তাকিয়ে থাকে। বলে, কোনো মেয়ে আজকাল কালো হয় না দিদি। বাজার-ভরা রূপের মশলা, কোন দুঃখে কালো হতে যাবে? বিধাতাপুরুষ যা খুশি একটা রং মাখিয়ে ছেড়ে দিলেন, এরা তারপরে নিজেরা মেজে-ঘষে খুঁত মেরামত করে নেবে। বিধাতাই তখন নিজের সৃষ্টি চিনতে পারবেন না।

ডলি হাসছে।

অরুণ বলে, আপনার মুখেই শুনলাম যে পলি কালো। এত মেলামেশায় আমি তো কখনো দেখতে পাইনি। মেক-আপ নিয়ে থাকে বোধহয় সর্বক্ষণ। তাই বা কেমন করে! ভোরে সদ্য ঘুম-ভাঙা অবস্থায় দেখেছি, স্নান করে বেরুনোর মুখেও দেখেছি। তবে গুণের কথা যা বললেন—ঝগড়া আর জেদ যদি গুণ বলে ধরেন, তা হলে বটে! পলির সমান গুণবতী ত্রিভুবন খুঁজে মিলবে না।

খুব একচোট হেসে নিয়ে ডলি বলল, বুঝেছি ভাই। মনস্থির করার কথা তবে আর বলব না—বাবাকে দিনস্থির করতে বলি। একই ফ্ল্যাটে থেকে বোন যাতে দিবারাত্রি গুণপনা দেখাতে পারে।

গিন্নিঠাকরুন সুবাসিনী এই সময় দেখা দিলেন। কথাবার্তা কিছু কানে গিয়েছে। বললেন, কালকেই কর্তা দিনস্থির করে ফেলেছেন। এই মাসের আঠাশে তারিখ। চাকরি হল তো বিয়ে কেন আর ঝুলিয়ে রাখা? এখনও বলেন নি কাউকে, মনে মনে রেখেছেন। অফিসে দু-একদিন যেতে থাকুক, তারপরে চাউর করবেন।

অরুণকে বললেন, তোমায় যে বাবা টিনের কথা বলেছিলাম।

কেরোসিন চাই এক টিন। এক বোতল যোগাড় করতে লোকে হিমসিম হয়ে যায়, গিন্নির পুরো টিনের ফরমাস। বলেন, নিত্যি নিত্যি কাকে খোশামোদ করতে যাবো। ও তুমি আস্ত টিনই একটা

জোগাড় করে দাও, মাস তিনেকের মতো নিশ্চিন্ত।

ফরমাস তো যখন-তখন—কোনদিন অরুণ 'না' বলেনি। বাড়ির গিন্নিদের এই পদ্ধতিতে মন জয় হয়, ভূয়োদর্শনে বুঝে নিয়েছে। আর এখন তো গিন্নির উপরে শাশুড়ি-মা হতে যাচ্ছেন উনি। দ্বিধা মাত্র না করে অরুণ যথারীতি ঘাড় কাত করে বলে, হবে।

হবে নয়, এখন পারো তো এখনই। উনুন ধরানো যাচ্ছে না, একেবারে বাড়ন্ত। পরশু থেকে অফিসে বেরুনো—তখন আর ঘোরাঘুরির সময় পাবে না। আর জামাই হবার পরে শুধুই তো গদিতে গড়ানো। কোন লজ্জায় তখন জামাইকে কেরোসিনের ফরমাস করতে যাব!

অরুণেন্দু বলল, আসে জয়ন্তর ভাঁড়াব থেকে। তাকে বলে রেখেছি। আবার সেখানে যাচ্ছি। ভাবনা করবেন না মা—দুপুরের মধ্যে যাতে পৌঁছে দেয়, তাই বলব।

ছুটল অরুণ গোলদারি দোকানে। জয়ন্ত এখন সেখানে, এতক্ষণে কাজে লেগে গেছে।

চাকরি পেলি তবে সত্যি সত্যি?

বৃত্তান্ত শুনে উল্লাসে জয়ন্ত পিঠে প্রচণ্ড এক চাপড় মারেঃ উঃ, পাঁচ পাঁচটা বছর যা লেগেপড়ে আছিস, গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসলে এই তপস্যায় ঈশ্বরলাভ হয়ে যেত।

অরুণেন্দু বলে, তা হয়তো হত। কিন্তু কি লাভ আমার ঈশ্বরে? কোন কাজটা করতেন তিনি? মাস মাস ঈশ্বর মা-বউদির খরচখরচা পাঠাতেন, মাকে কলকাতায় এনে ডাক্তার দেখাতেন? আমার ধার-দেনা শুধতেন তিনি? পলিকে বউ করে এনে দিতেন? এত সমস্ত হয়ে যাচ্ছে ঝটপট। অ্যাপয়েন্টমেন্ট-লেটার আজ পাচ্ছি, বিয়েরও দেরি হবে না। আঠাশে আষাঢ়।

জয়ন্ত সহাস্যে বলে, পাসনি এখনো, তাই এতদূর—পাওয়ার

পরে কী হবে তাই ভাবছি। এক ভিখারি লটারিতে দু-লক্ষ টাকা পেয়ে ক্যা-হুয়া হুক্কা-হুয়া হুক্কা-হুয়া করে শিয়াল-ডাক ডাকতে ডাকতে নাকি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। দুটো থেকে তিনটেয় যেতে বলেছে—কাজ চুকিয়ে ফিরে আসতে ধর্ চারটে। সোজা তোর নতুন ফ্লাটে চলে যাবি, জলের বালতি-টালতি জোগাড় করে আমরা সব হাজির থাকব। অজ্ঞান হলে মাথায় জল থাবড়াতে হবে।

সুবাসিনীর কেরোসিনের কথা আগেই বলা আছে, অরুণেন্দু আবার সেটা মনে করিয়ে দিল: পুরো এক টিন কিন্তু ভাই—

জয়ন্ত বলে, আলবত। চাকরি দিচ্ছে—কেরোসিন কেন, মধু ভরে দেবো টিনে।

উঁহু, কেরোসিনই। পাঁচ বছরে নিদেনপক্ষে পাঁচ-শ জায়গায় উমেদারি করেছি। মধুর থাকতি নেই—মুখে মুখে দেদার মধু সকলের। অমিল কেরোসিন। কেরোসিনের টিন দুপুরের মধ্যে যেন পৌঁছে যায়, সেইটে দেখিস। কথা দিয়ে এসেছি।

জয়ন্ত চোখ কপালে তুলে বলে, ওরে বাবা, দিনদুপুরে কেমন করে হবে। জনতা বড় সেয়ানা আজকাল। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে বোতল হাতে লাইন দিয়ে আছে—হাতে-নাতে ধরতে পারলে মুণ্ডু ছিঁড়ে নেবে।

বিপন্নকণ্ঠে অরুণ বলল, হবু-শাশুড়িকে আমি যে কথা দিয়ে এলাম।

দিন-দুপুরে না হল, রাত-দুপুরে। কাজই তো আমার এই। দোকানের একটা ঠাট রেখে দেওয়া আছে—যেটা চাইবে, বাঁধা-জবাব: নেই। বলে রাখবি ওঁদের—পিছন-দরজায় টোকা পড়বে, দোর খুলে দেবেন—টিন অমনি টুক করে ভিতরে গিয়ে পড়বে।

উঠল অরুণেন্দু। এবারে চাঁদ-কেবিন। আড্ডা জমজমাট না থাকলেও ছিটেফোঁটা আছে নিশ্চয় এখনো। এতবড় খবর চেপে রাখা দুঃসাধ্য। আড্ডার মহৎ গুণ—চুপিসারে একটুকরো কথা ছাড়ুন, মুহূর্তে সহস্র গুণ হয়ে শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে। রেডিও এতদূর পারে না।

জয়ন্তও পিছু ধরল। বলে, জায়গায় বসে মাল মাপামাপি ভালো লাগে এখন এই অবস্থায়? চেঁচামেচি লাফালাফি করে আসি খানিক, নয়তো অপঘাত হবে, দম ফেটে মরে যাবো।

যাচ্ছে দু-জনে। খামোকা জয়ন্ত বলে ওঠে, চাকরি আমায় একটা দিত কেউ! দোকানের কাজে ইস্তফা দিয়ে প্রাণভরে গঙ্গায় নেয়ে নিতাম। চেয়ারে বসার চাকরি না দেয়, বেয়ারা হয়ে টুলে বসতেও রাজি। লোকে না খেয়ে মরে, আর খাবার জিনিষ কালোবাজারে সরিয়ে এরা টাকা পেটে। সামনের উপর আমায় রেখেছে—ধরা পড়লে ওরা ধর্মের বুলি কপচাবে, জেল-ফাঁস জনতার হাতের গণ-ধোলাই যত-কিছু আমার উপরে চলবে।

ভাঙা আড্ডা—খবর শুনে তবু যথাশক্তি কলরব করে উঠল। জয়ন্তকে বলে, মিষ্টিমিঠাই একলা তুমি সাপটাবে—সেটি হচ্ছে না। চারটেয় সবাই আমরা ফ্লাটে যাব। ভাল করে খাওয়াতে হবে, কিপটেপনা চলবে না আজ।

আকাশ অন্ধকার। থেকে থেকে বৃষ্টি নামছে, মেঘ তবু কাটে না। চারটের কিছু আগে থেকেই ফ্লাটের সামনে জয়ন্ত হা-পিত্যেশ দাঁড়িয়ে। বৃষ্টিটা যখন জোরে আসে, সামনের বাড়ির গাড়ি-বারান্দার নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপরে চাঁদমোহন প্রভৃতিও এসে গেল। অরুণের দরজায় তালা ঝুলছে। গাড়ি-বারান্দার নিচে এদের গুলতানি চলল বেশ খানিকক্ষণ।

তীরবেগে ট্যাক্সি এসে থামল। ট্যাক্সি মেরে হাজির হলেন—কে মানুষটি দেখ্ দিকি ঠাহর করে! অরুণেন্দু বটে তো! সকালের সেই অরুণ এখন বিকালবেলা লাটসাহেবের মেজাজে ট্যাক্সি থেকে নামল।

আড্ডার মানুষ অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে—হো-হো করে অরুণেন্দু খুব একচোট হেসে নিল। একটি একটি করে সকলের মুখ পানে

তাকায়। বলে, এত জনে জুটেপুটে এসেছিস! দেরি হয়ে যাচ্ছে, তবু কেউ তোরা নড়বি নে, নিশ্চিত জানতাম। কত দাম আজকে আমার!

মিটারে ষোলটাকার মতো উঠেছে। দুটো দশটাকার নোট পকেট থেকে টেনে অরুণ আলটপকা ছুঁড়ে দিল। ড্রাইভার খুচরো ফেরত দিচ্ছিল, হাত নেড়ে দিল সে: দিতে হবে না, বখশিস। চলে যাও তুমি।

লম্বা সেলাম দিয়ে ড্রাইভার গাড়ি হাঁকিয়ে দিল। গতিক দেখে চক্ষু সকলের ছানাবড়া। হিসাবি ছেলে অরুণেন্দু—এক পয়সার মা-বাপ। এই নিয়ে কত ঠাট্টাতামাসা হাসি-মস্করা। চাকরি পেতে না পেতেই সম্রাট হর্ষবর্ধন হয়ে দানযজ্ঞ লাগিয়ে দিয়েছে। ট্যাক্সি বিনে চলা যায় না। নোটগুলো খই-মুড়ির সমান, মুঠো করে ছুঁড়ে দেওয়া হয়।

জয়ন্ত বলে, ষোলটাকা উঠে গেছে—গিয়েছিলি কোথা রে?

অরুণেন্দু বলে, কলকাতা শহরটা কত বড়—ভাবলাম, চক্কোর দিয়ে আন্দাজ নিয়ে আসি।

এই বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে?

বৃষ্টিটা বড্ড জোরে এলো—আর মনে পড়ে গেল, তোরা সব আসছিস। সবটা সেইজন্যে হল না, আধাআধি ঘুরে ফিরলাম।

জয়ন্ত গা টিপল চাঁদমোহনের। অর্থাৎ, বলেছিলাম না? স্ফূর্তির চোটে মাথার ঠিক নেই অরুণেন্দুর এখন। অতিশয় স্বাভাবিক। চাকরির আশা ছেড়েই দিয়েছিল, সেই জায়গায় এমন চাকরি—সোনার-খনি হীরের-খনি বললেই হয়। কেনাকাটা ও কন্ট্রাকটরদের বিল পাশ করার সেকশন—সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরবার মুখে দু-পকেট নোট ও আধুলি-সিকিতে ঠাসা। ছেঁড়া-অচল অনেক চালায় বটে, কিন্তু সেগুলো বাদ দিয়েও যা রইল—খুদ ম্যানেজারেরও লালসা জাগে চাকরি বদলাবদলি করবার জন্য।

সকলে হৈ-চৈ করছে: চাকরি হল অরুণ, খাইয়ে দে আমাদের—

অকাট্য জবাব ছিল: চাকরিই দিয়েছে, মাইনে তো দেয়নি। মাস পুরতে দে, মাইনেটা হাতে আসুক, খাওয়া-টাওয়া তখন। যে-না-সে এই বলে কাটান দিত। কিন্তু অরুণেন্দু আপাতত সম্রাট-শাহানশা—কথা পড়তে না পড়তে পকেটে হাত ঢুকে যায়। পকেটও রাজভাণ্ডার। খান চারেক নোট মুঠো করে তুলে অবহেলায় চাঁদমোহনের দিকে ছুঁড়ে দিল: চাঁদ-কেবিনে গিয়ে কবিরাজি-কাটলেট ভাজানোর জোগাড় দেখ্। খবর চাউর হয়ে পড়েছে, পুরানো ঘাঁটিতে বিস্তর এসে জুটবে। বেশি করে ভাজে যেন, যে যতগুলো চায় দিতে হবে। কাটলেটের সঙ্গে রাজভোগ। রসগোল্লা বুঝি বেআইনি—খোঁজ নিয়ে দেখগে, চোরাগোপ্তা অনেকখানে আছে। দামটা হয়তো ডবল। ত্রিভুবন খুঁজে যে দামে মেলে বের করে আনবি।

চাঁদমোহন অবাক হয়ে শুনছে, আর অন্যমনস্কভাবে হাত ঘষে নোটের ভাঁজ সমান করছে।

হি-হি করে হেসে অরুণ বলে, জাল-নোট কিনা দেখছিস বুঝি?

চাঁদমোহন বলে, নোটের কি দেখব রে, দেখতে হবে তোর পকেট। নোট ছাপানোর কল আছে পকেটে, ঝরঝরে নোট ছাপা হয়ে বেরুচ্ছে।

পকেট থেকে একনাগাড় নোট বের করে যাচ্ছে—সকালবেলা যে-পকেট ছিল ফাঁকা গড়ের-মাঠ। ম্যাজিক দেখাচ্ছে, না সত্যি সত্যি?

চাঁদমোহন প্রশ্ন করে: মাইনে অগ্রিম দিল নাকি?

জয়ন্ত বলে, তাই বুঝি দিয়ে থাকে! ধার করেছে। চাকরি হল, ধার পাওয়া এবারে তো সোজা।

অরুণ ভ্রূভঙ্গি করে বলে, কঠিন কবে ছিল শুনি? চিরকেলে পাঁড়-বেকার আমি, তা দিসনি ধার তুই জয়ন্ত? দিসনি ধার চাঁদমোহন? ফেরত পাবি সেই আশায় দিয়েছিলি?

চাঁদমোহনের তুড়ুক জবাব: আলবত! ফেরত তো পাবই—

শুধো টাকা কয়েকটা নয়, কড়ায় গণ্ডায় যাবতীয় সুদ হিসাব করে। ব্যবসাদারের টাকা—হেঁ-হেঁ, এ জিনিষ হজম করা চাট্টিখানি কথা নয়।

কথা না বাড়িয়ে চাঁদমোহন ছুটল। অতগুলো কাটলেট বানাতে সময় লাগবে। মালেও বোধহয় কম পড়বে, ঝটপট কিনে ফেলতে হবে বাজারে গিয়ে। অরুণ তালা খুলে ফ্ল্যাটে ঢুকছে। অন্যদের বলে, তোরা এগুতে লাগ, হাত-পা ধুয়ে কাপড়-চোপড় বদলে আমি আসছি।

পলি দেখা দিল। অফিস থেকে সোজা এসেছে। হাঁক পাড়ছে: খবর কি ?

অরুণ দরজায় এলো। উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলে, এসে গেছ তুমি—ষোলকলা পরিপূর্ণ হল। সম্রাট অরুণেন্দু ফিস্টি দিচ্ছেন। চাঁদ-কেবিনে বিষম মজা—হৈ-হৈ ব্যাপার, রৈ-রৈ কাণ্ড। চলো।

এসেছে পলি দ্রুতপায়ে। নিশ্বাস ঘন। পুলকিত কণ্ঠে বলল, আবার কিন্তু ক্রিমিন্যাল কাণ্ড করেছি। ফ্ল্যাটের জন্য যেমন করেছিলাম। তোমার নাম জাল করেছি।

উল্লাসে কি করবে ঠাহর পায় না। কল-কল করে অবিচ্ছেদ বলে যাচ্ছে, একবার করে সাহস বেড়ে গেছে আমার। দেখলাম, ভালোই তো হয়। আবার আজকে। অবিকল তোমার মতন করে সই মেরে দিয়েছি।

অরুণ বলে, গাড়ি রেজেস্ট্রি করলে বুঝি ?

গাড়ি এখন নয়, সে কথা তো হয়ে গেছে। তার চেয়ে অনেক জরুরি। মায়ের নামে মনিঅর্ডার করলাম। করলে তুমিই—আমি কেউ নই। ভালো চাকরি হয়েছে—কুপনে সুখবর জানিয়ে দিয়েছ। বাসার ঠিকানাও দিয়েছ। লিখেছ: তোমায় আর বউদিকে এক্ষুনি গিয়ে নিয়ে আসতাম, কিন্তু চাকরির দরুন দেরি পড়ে যাচ্ছে, ছুটি নিয়ে চলে যাব শিগগির।

শুনছে অরুণ, আর পরম কৌতুকে উপভোগ করছে। প্রশ্ন

করে ঃ কত টাকা পাঠিয়েছি আমি মাকে ?

পঁচিশ—

ওতে কি হবে, বেশি পাঠালাম না কেন ? কতদিন খবর নিইনি, বিস্তর ধারদেনা হয়েছে ওঁদের।

পলি সায় দিয়ে বলল, ঠিকই তো। কিন্তু মাসের শেষ—হাতে আর ছিল না। তুমি কাল মায়ের কথা বলছিলে, ইচ্ছেটা তখনই মনে এলো। বাড়ি ফিরেই আবার বাবার মুখে চাকরির খবর। মোটে আর সবুর সইল না। ভাবলাম, এত আনন্দ আমাদের—তাঁরা কেন এর ভাগ পাবেন না ?

অ-হ-হ! বিদ্রূপকণ্ঠে অরুণ বলে উঠল।

হাসছে সে খল খল করে। থতমত খেয়ে পলি চুপ করে যায়।

অরুণ বলে, মোটা ঘুষ দিয়ে ফ্লাট জোটালে আমার জন্য। ফার্নিচার কিনে কিনে ডাঁই করছ, মনিঅর্ডার করলে আমার মায়ের নামে। টাকা যেন খোলামকুচি। কেন, কেন বলো তো ?

ততক্ষণে সামলে নিয়ে পলি ধমকের সুরে বলল, আমার-আমার কেন করছ শুনি ? আমাদের। ফ্লাট আমাদের, ফার্নিচার আমাদের। মা আমাদের—তোমার, দাদার, দিদির, আমারও। একটি টাকাও আমি অপব্যয় করিনি। সে বরঞ্চ তুমি। খানাপিনা এক্ষুনি না হয়ে কয়েকটা দিন চেপে থাকলেই হত। বিয়েয় কিছু-না-কিছু করতেই হবে—এক খরচায় হয়ে যেতো।

খানাপিনাও তোমার টাকায়—

পলি আকাশ থেকে পড়ে ঃ আমি কখন টাকা দিলাম ?

তুমি নয় তো কি আমি ? পাছে টাকা চেয়ে বসেন, সেই আতঙ্কে মাকে একটা চিঠি পর্যন্ত লিখিনে।

পলি সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে আছে। অরুণ বলল, ফ্লাটের ভাড়ার টাকা, ফার্নিচারের বিলের টাকা—তোমার অনেক টাকাই তো আমার কাছে জমা রেখেছ।

পলি আঁতকে ওঠে ঃ সেই টাকার নয়-ছয় করছ তুমি ?

শান্ত হাসি-ভরা মুখ অরুণের। বলে, অন্যায় করেছি—না? বড্ড অন্যায়—

চাকরির আহ্লাদে এমন বেপরোয়া হয়ে পড়েছ—কী আশ্চর্য! পয়লা তারিখে ওয়াদা—টাকা না পেলে যাচ্ছেতাই করে শোনাবে। শুনতে হবে তোমাকেই।

অরুণেন্দুর দৃকপাত নেই। বলে, আসুক সেই পয়লা—

পলি বলে, পয়লা পরশু—একটা দিন মাত্র মাঝে। টাকা কত খরচ হয়ে গেছে বলো দিকি।

হাসতে হাসতে অরুণ বলে, তা হয়েছে বই কি। গণে কে দেখেছে! অর্ধেক শহর টাক্‌সিতে চক্কোর দিয়ে এলাম, ইচ্ছে মতন দান-খয়রাতও হয়েছে। তারপরে এই আমোদের খাওয়া। সত্যি কী ভালো যে লাগছে আজ!

আর পলি ছটফট করে মরছে: মাথা খুঁড়ি না কী করি—পরশুদিন সামাল দেবো আমি কেমন করে?

নিজের ভাবে একটানা অরুণেন্দু বলে যাচ্ছে, খাসা লাগছে। উমেদারির শেষ—কারো খোশামোদের ধার ধারিনে। যেটা ইচ্ছে করতে পারি। মনের ভিতরের কথা মুখে বের করতে আটক নেই, ইতরকে মহৎ কালোকে ফর্শা বলতে হয় না। ভাবনা-চিন্তা দায়-দায়িত্ব সমস্ত কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে। ইচ্ছে হলে উড়ে বেড়াতে পারি বোধহয়।

বাধা দিয়ে পলি বলল, দায়দায়িত্ব গেল কিসে? এবারে তো বেশি হয়ে আসছে। বাবা তারিখ অবধি ঠিক করে ফেলেছেন—আষাঢ়ের আঠাশে।

দু-হাতের বুড়োআঙুল আন্দোলিত করে অরুণেন্দু বলে, ঢনঢন ঢনঢন। আষাঢ়ে জন্মমাস আমার, বিয়ে হয় না।

মুখে হাসির লহর খেলছে—সত্যি নয় কখনো, ক্ষেপাচ্ছে। পলিও অতএব চপল সুরে বলল, হয় গো খুব হয়—গোড়ার তেরোটা দিন বাদ দিয়ে। ধাপ্পা দিচ্ছ কেন? মায়ের যদি খুঁতখুঁতানি থাকে,

বেশ তো, ক'টা দিন পরে শ্রাবণের গোড়াতেই হতে পারবে।

একবার এদিক একবার ওদিক, কলের পুতুলের মতন অরুণ ক্রমাগত ঘাড় নাড়ছেঃ নয়, নয়। শ্রাবণে নয়, অঘ্রাণে নয়, কোনদিনই নয়। এমন রূপবান আমি, কালো মেয়ে বিয়ে করতে যাবো কেন?

ঠাট্টা যদি হয়ও, তবু কানাকে কানা খোঁড়াকে খোঁড়া এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে কালো বলা অতিশয় জবর ঠাট্টা। অপমানে কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে পলির। ঠেশ দিয়ে বলে উঠল, কালো বুঝি আজ প্রথম হলাম! কালই তো দিদিকে বলছিলে—

অরুণ বলে, তাই বটে! পলি কালো মেয়ে—কথাটা শুনে চমক খেয়েছিলাম কাল। কিন্তু কাল আর আজ এক নয়—তখন উমেদার ছিলাম আমি। উমেদার মানুষ থাকে না—বানিয়ে বানিয়ে নানান আজব কথা বলে। বলতে বাধা হয়। তা বলে, তুমি তো অন্ধ নও—আমার নির্জলা চাটুবাক্য বিশ্বাস করলে কেমন করে?

দু-চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পলির উপর ফেলে হঠাৎ হা-হা করে হেসে উঠল: কী উৎকট কালো রে বাবা! আচ্ছা, কালো মানুষের ঘামও কি কালো হয় পলি? ঘামে ঘামে তোমার গায়ের জামাটা অবধি কালো হয়ে গেছে।

ঘাম নয়, পলির গায়ে বৃষ্টির জল। এবং পরেছে সে কালো অর্গাণ্ডির জামা। ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দেওয়া এর পরে অসম্ভব। ভিতরে রহস্য আছে নিশ্চয়। সুব্রতা ছিল—বর পরিচয় দিয়ে সঙ্গে নিয়ে ঘুরত। এই সুপুরুষ ছেলে—একা সুব্রতায় কখনো শেষ নয়। কত সুব্রতা কত দিকে—এবারে আরো চাকরি পেয়ে গেছে। রসগোল্লার উপর মাছির মতন নানান দিক থেকে তারা সব ছেঁকে ধরেছে ঠিক।

ব্যঙ্গের সুরে পলি বলল, এ কালো হঠাৎ বড় উৎকট লাগছে—আমার বাবার দয়ায় চাকরিটা পেয়ে যাবার পর।

অরুণ বলে, তোমার বাবা দয়া কাউকে করেন না। বরাবর ঘুষ নিয়ে এসেছেন, বিপাকে পড়ে এইবারটাই কেবল ঘুষ দিতে

হচ্ছে। চাকরি ঘুষ দিয়ে মেয়ে গছানো।

ক্ষেপে গিয়েছে পলি: চাকরি দিয়েছেন, এই চাকরি কেড়ে নিতেও পারেন তা জেনো।

অরুণ কিছুমাত্র ভয় পায় না। বলে, বেশ তো, চাকরিটা যেখানে যাবে, প্রণয়ও সেই খানে চালান করে দাও। চুকে-বুকে গেল। আহা, রাগ করো কেন? আশাসুখে ফ্লাট সাজাচ্ছ, ফ্লাট তোমায় নিঃস্বত্ব হয়ে ছেড়ে দিচ্ছি, আটকে রেখে শাপমন্যির ভাগী হব না। বিয়ে করে এই ফ্লাটেই এই সব ফার্নিচার নিয়ে বরের সঙ্গে ঘরকন্না পেতো।

পাটভাঙা ধুতি-জামা পরে ছিল অরুণ। তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়াচ্ছে। পলির দিকে তাকিয়ে বলল, চোখ যে ছলছলিয়ে উঠল—হা-হা। আবার কিছু খাটনির তালে পড়ে গেলে, কিছু সময়-ক্ষেপ—নতুন এক জনের সঙ্গে জমিয়ে নিতে হবে।

দরজায় তালা আটকে দিয়ে বলল, চাঁদ-কেবিনে ফুর্তিফার্তি এখন। ফুলস গিভ ফিস্ট—খাবার-দাবার সমস্ত তোমার টাকায়। অফিস থেকে ছুটতে ছুটতে এসেছ—খেয়ে তুমিও কিছু উশুল করে যাও পলি। গরম গরম কাটলেট, অ্যাব্বড়ো অ্যাব্বড়ো রাজভোগ—

হাত ধরতে যাচ্ছিল। পলি গর্জন করে উঠল: খবরদার!

কাল সকালে এসো তবে একবার। অতি অবশ্য এসো। ফ্লাটের কালই দখল দিতে পারব, মনে হচ্ছে।

বারান্দার উপর দুম করে লাথি মেরে পলি বলল, বয়ে গেছে—

পাক দিয়ে ঘুরে চোখের জল চাপতে চাপতে ফরফর করে সে বেরিয়ে গেল।

।। বারো ।।

চাঁদ-কেবিনের পিছন দিককার ঘর। আড্ডা ভারি জমজমাট, গরহাজির বড় কেউ নেই। অরুণেন্দু বসতে না বসতেই—পলিকে এই তো তাড়িয়ে এলো—তার ভাই প্রণব খোঁজে খোঁজে এসে উপস্থিত।

লাটসাহেবি মেজাজে অরুণ হাঁক দিল : কি চাই ?

এমনধারা কণ্ঠ প্রণব আর কখনো শোনে নি। ভয় পেয়ে সে মিনমিন করে বলল, মা পাঠালেন। টিন তো পৌঁছল না এখনো।

টিন—কিসের টিন ?

এরই মধ্যে বেমালুম সব যেন বিস্মরণ হয়ে গেছে। প্রণব থতমত খেয়ে বলল, কেরোসিন যাবে, সেই যে কথা ছিল।

না, যাবে না। বেআইনি জিনিস কেন যেতে যাবে ?

জয়ন্ত অরুণের মুখে তাড়াতাড়ি হাত চাপা দিল : চুপ—কী যা-তা বলছিল !

জবাবটা নিজেই দিয়ে দিল : রাত্রের মধ্যে গিয়ে পড়বে, বলো গিয়ে খোকা। ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

জয়ন্তর হাত ঠেলে সরিয়ে অরুণ বলে, কক্ষনো না। যদি পাঠাতে যাস জয়ন্ত, পুলিশ ডেকে তোকেই ধরিয়ে দেবো। কেনা-গোলাম নাকি যে হুকুম হলে জীবনপণে সেই সেই জিনিষ জোগাড় করতে হবে ? ঢের ঢের করেছি, আর নয়। ঘাড় হেঁট করে বেড়ানোর গরজ ফুরিয়ে গেছে, কাউকে কেয়ার করিনে আর এখন।

ছেলেমানুষ প্রণব অতশত কী বোঝে ! ধমক খেয়ে মুখ চূণ করে সে চলে গেল।

আর অরুণেন্দু হাসিতে ফেটে পড়ে তার পিছনে: গরজের ধাক্কায় না ঘুরতে হলে কী মজা তখন মানুষের—হা-হা, কী মজা!

পাগলের মতন করতে লাগল : কী মজা, কী মজা!

জয়ন্ত ভৎর্সনা করেঃ এমনিধারা তুই—তোর এ মূর্তি ভাবতেও পারি নি কোনদিন। চক্ষুলজ্জা বলেও কি কিছু থাকতে নেই—ছিঃ!

চাঁদমোহনও টিপ্পনী কাটেঃ কাজের সময় কাজি কাজ ফুরোলে পাজি—সে তো জানা কথা রে ভাই, দুনিয়াময় চলে আসছে। কিন্তু ভোল-বদল বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে। দৃষ্টিকটু ঠেকছে—আমাদের পর্যন্ত।

অরুণ কানেও নিল না। হাসিমুখে তৃপ্তিভরা কণ্ঠে বলে যাচ্ছে, বিশ্রী এক দুঃস্বপ্ন যেন চেপে ছিল—ঘুমটা ভেঙে রেহাই পেয়ে গেলাম। কারো আর তাঁবেদার নই আমি, জোড়হাতে আজ্ঞে-আজ্ঞে করিনে। সম্রাট হবো, আচায্যিঠাকুর গণেপড়ে বলে দিয়েছিলেন—ফলে গেল তাই। যেটা ভাবি, মন খুলে বলতে পারছি—খাতির-উপরোধ নেই। ছোট্টবেলা যেমনটা ছিলাম।

নম্র শান্ত সুন্দর-চেহারার যুবা ছেলে—লাজুক-লাজুক ভাব। দেখা যেত, আড্ডার একেবারে কোণটি নিয়ে চুপচাপ আছে। শুনত অন্যদের কথা, মজার কথায় নিঃশব্দ হাসির ছোঁয়া লাগত ঠোঁটের আগায়, কালেভদ্রে কদাচিৎ নিজে কথা বলত। সেই অরুণেন্দুর বিক্রম দেখ আজ—টগবগ করে কথা ফুটছে মুখে, হৈ হৈ করে চেঁচাচ্ছে, হাসিতে ঘর ফাটাচ্ছে, খাচ্ছে রাক্ষসের মতন। অবাক হয়ে সবাই বারম্বার তার দিকে তাকায়। একটা চাকরির জন্য, মা-ভাইকে একটু সুখ-সোয়াস্তি দেবার জন্য, বছরের পর বছর কী কষ্টটাই না করেছে! বড় আকাঙ্ক্ষার ধন হাতের মুঠোয় এসে পড়লে মানুষ বুঝি এমনি হয়ে যায়।

রসভঙ্গ হঠাৎ। খাতা লিখতে যায় নি বলে দোকানের মালিক লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাজ কামাই করে জমাটি আড্ডার ভিতরে অরুণ, প্রধান আড্ডাধারী সে—দেখে লোকটার মেজাজ চড়ে গেল।

বলে, উকিলবাবু আজ নিজে এসে কি করতে হয় না-হয় বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন, তা তোমারই দেখা নেই। কর্তা তাই ব্যস্ত হয়ে আমায় পাঠালেন: অসুখবিসুখ করেছে ঠিক—নয় তো এ-দিনে কামাই করার কথা নয়। ভালোই হল, স্বচক্ষে দেখে গেলাম। অসুখের যাবতীয় লক্ষণ কর্তার কাছে নিবেদন করিগে।

দায়ে-বেদায়ে আগেও এক-আধবার কামাই হয়েছে। অরুণেন্দু হাত জড়িয়ে ধরে কাকুতিমিনতি করবে, চা-রাজভোগ খাওয়াবে—লোকটার এই প্রত্যাশা। অরুণ কিন্তু ফ্যা-ফ্যা করে হাসে।

আর যাবো না, বলে দিও তোমার কর্তাকে। ভাগো।

হকচকিয়ে গিয়ে লোকটা বলে, হিসেব লেখার কাজ—না যাবে তো আগেভাগে নোটিশ দিতে হয়। হুট করে এক্ষুনি কাকে পাওয়া যায়?

অরুণ বলে, দোকানের মুটে আছে কতজনা, গাড়োয়ান আছে, তাদেরই কাউকে ধরো না। উহুঁ, পাশ করেনি, ডিগ্রি-ডিপ্লোমা নেই তাদের—পনের টাকায় তারা করতে যাবে কেন? কত কত বি-এ, এম-এ ঘুরছে, তাদের দেখ গিয়ে। পাবে—গাদা গাদা পেয়ে যাবে।

কী মাতামাতিটা করল সারাক্ষণ! চাকরি পেয়ে বর্তে গেছে অরুণ। বারোটা বেজে গেল, আড্ডা গুটানোর তবু লক্ষণ নেই।

জয়ন্ত বলে, বুঝি ভাই, স্ফূর্তির সাগরে ভাসছিস। তার উপরে অফিসের কাল ছুটি। কিন্তু আমাদের কি! সকালে উঠেই ফের দাঁড়ি ধরা—সারা রাত্তির জেগে পেরে উঠব কেন?

হাত ধরে জোরজার করে টেনে তুলল। মোড় অবধি সঙ্গে সঙ্গে গেল।

।। তেরো ।।

বারান্দার উপর লাথি মেরে পলি বলে দিয়েছিল, আসবে না সে, কিছুতেই না, আসতে বয়ে গেছে তার। কিন্তু রোদ ওঠার আগেই হন্তদন্ত হয়ে সে চলে এসেছে। ঘোরাঘুরি করল ফ্লাটের সামনে। শেষটা বারান্দায় উঠে পড়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

অরুণেন্দু ওঠে নি, দরজা বন্ধ।

দরজার কাছে গিয়ে চুপিচুপি ডাকে : অরু, অরুণ, দরজা খোল, কথা আছে। ও অরুণ—

চিন্তাভাবনা ফাঁকা হয়ে গিয়ে অরুণেন্দু গাঢ় ঘুম ঘুমাচ্ছে। শুনতে পায় না। আর মেয়েছেলে হয়ে পাড়ার মধ্যে চেঁচামেচি করে ডেকে তোলেই বা সে কোন লজ্জায়?

নিরুপায় পলি ছটফট করে বেড়াচ্ছে, কী করবে ভেবে পায় না।

তখন জয়ন্তর কথা মনে হল। অরুণের সুখে দুঃখে দুই পরম বন্ধু—জয়ন্ত আর চাঁদমোহন। জয়ন্ত ইতিমধ্যে দোকানে এসে গেছে, একটি দু'টি খদ্দেরও আসছে। হাত নেড়ে পলি জয়ন্তকে বাইরে ডাকল।

চলুন একবার জয়ন্তবাবু। আপনার বন্ধু এখনো পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। অসুখবিসুখ করল না কি হল, ডেকে দেখুন।

জয়ন্ত বলে, রাত দুপুর অবধি আড্ডা চলেছিল। তার উপর ছুটির দিন আজ, কাল থেকেই তো ঘানি-কলে জুড়ে দিচ্ছে—

পলির উতলা ভাব দেখে হেসে ফেলল সে। বলে, ভাবনার কি আছে? আজকের দিন আগেকার দিনগুলোর মতো নয়। কত কালের আশা পূরণ হল—নির্ভাবনায় প্রাণ ভরে ঘুমুচ্ছে বেচারি। আহা, ঘুমোক।

পলি কেঁদে ফেলল : হয় নি ওর চাকরি—

অ্যাঁ ? বলে বজ্রাহতের মতো জয়ন্ত দাঁড়িয়ে পড়ল।

পলি বলে, হওয়া-চাকরি ফসকে গেল। অন্য লোকে পেয়েছে।

বলেন কি ! এমন তো হবার কথা নয়।

আমিও কি জানতাম ? একগাদা কুচ্ছো কথা না-হক শোনাতে লাগল আমায়, রাগ করে চলে গেলাম। প্রণবকে এত ভালবাসত, তাকেও ধমকেছে খুব, বাড়ি গিয়ে সে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল। এমনধারা মেজাজ ওর কোনদিন কেউ দেখি নি।

জয়ন্ত জুড়ে দেয় : দোকানের কাজে যায় নি বলে একটা লোক ডাকতে এসেছিল, তাকেও যাচ্ছে-তাই করে বলল।

পলি আকুল হয়ে বলল, তবেই দেখুন। এত কাল ধরে মিশছেন, দেখেছেন এমনধারা ? আমার ভয় করছে। কাল রাত করে বাবা বাড়ি ফিরলেন, তাঁর কাছে বৃত্তান্ত শুনলাম। পাজি ম্যানেজারটা বাগড়া দিয়ে দিল।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট-লেটার সইয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে। জেনারেল ম্যানেজার মাধব প্রামাণিকের ঘরে কাশীনাথের ডাক পড়ল।

চেয়ার দেখিয়ে প্রামাণিক বললেন, বসুন মিস্টার কর। বড়-সাহেবের খুব বেশি আস্থা আপনার উপর।

আড়ালে যত তম্বি করুন, এখানে ভিন্ন মূর্তি। হেঁ-হেঁ করে তৃপ্তি ভরে কাশীনাথ হাসেন : একলা বড়সাহেব কেন, আপনার আস্থাই বা কম কী! আপনাদের নেকনজরে আছি বলেই দু-বেলা দুটো ডাল-ভাত খেতে পাচ্ছি।

ডাল-ভাত নয়, সেটা জানি। রীতিমতো পোলাও-কালিয়া। কী করে খান, তারও বিস্তর কেচ্ছা আমার ফাইলে আছে। ফাইল জমতে জমতে পর্বতপ্রমাণ হয়েছে।

কাশীনাথ বললেন, আপনাদের দয়া আছে বলে আমার উপর

সকলের হিংসা। শত্রু আমার অনেক।

মাধব প্রামাণিক হাসিমুখে আগের কথার জের ধরে বলছেন, ফাইলের সেই পর্বত আমি আলমারির ভিতর ঢুকিয়ে তালা আটকে রেখেছি। যে পর্বতের, বেশি নয়, একটা-ছুটো পাথর খেলেই আপনি গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাবেন।

বলে মুখস্থর মতো গড়গড় করে গোটা তিনেক নমুনা ছাড়লেন। কাশীনাথ ভেবেছিলেন, সেই সেই পার্টি এবং তিনি ছাড়া তৃতীয় যিনি জানেন, তিনি হলেন অন্তর্যামী ভগবান। ভগবানের সঙ্গে মৃত্যুর পরে বোঝাপড়া—রিটায়ার করার পরে ভগবান নিয়ে পড়া যাবে, তাড়াহুড়ো কিছু নেই। কিন্তু এখন বুঝলেন, চতুর্থও আছে —এই মাধু প্রামাণিক। মুখ পাংশুবর্ণ তাঁর, নতুন দৃষ্টি খুলে গেল। এক-নম্বরের হাঁদারাম বলে ম্যানেজারকে বরাবর তাচ্ছিল্য করে এসেছেন—এই ব্যক্তি, দেখা যাচ্ছে, তাঁর অনেক উপর দিয়ে যায়।

হাসিমুখে পরম শান্তভাবে প্রামাণিক অবস্থাটা উপভোগ করছেন। প্রতিবাদে না গিয়ে কাশীনাথ সকাতরে বললেন, তালা আটকানোই থাক স্যার। বেরিয়ে পড়লে এ-বয়সে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব?

রিটায়ারের বাকি কত?

কাশীনাথ একটু হিসাব করে বললেন, পাঁচ বছর তিন মাস।

বেশ, তার মধ্যে ও-আলমারি খোলা হবে না। বড়সাহেবের আস্থা নড়তে দেওয়া হবে না—এত বড় আস্থা যে, লোক বাছাইয়ের ষোলআনা দায়িত্ব সকলকে বাদ দিয়ে আপনার উপর দিয়েছেন।

সইয়ের জন্য রাখা হয়েছে সেই চিঠির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে প্রামাণিক বললেন, কে-একজন অরুণেন্দু ভদ্রের নাম দেখছি টাইপ হয়ে এসেছে।

কাশীনাথ নিরীহ কণ্ঠে বলেন, তবে কোন নাম হবে স্যার?

ভূপেন্দ্রনাথ সুর। নতুন করে টাইপ করে আনুন।

কাঁটায় কাঁটায় ছুটো। দোর ঠেলে অরুণ ভিতরে ঢুকে দেখল,

পরম বন্ধু ভূপেন কাশীনাথের টেবিলে মুখোমুখি জমিয়ে বসে চা খাচ্ছে। অরুণকে কাশীনাথ চিনতেই পারলেন না।

থানায় খবর গেল। গুটি কয়েক কনস্টেবল নিয়ে অফিসার এসে পড়লেন। কাল রাত্রে যারা সব আড্ডা জমিয়েছিল, তাদেরও কেউ কেউ হন্তদন্ত হয়ে এসেছে। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে হল।

ছাতের আংটার সঙ্গে দড়ি বাঁধা—অরুণেন্দু মড়া হয়ে ঝুলছে। জিভ বেরিয়ে পড়েছে বিঘতখানেক। ওষ্ঠের ফাঁকে চকচকে দু-পাটি দাঁত। চোখ দুটো ডবল তে-ডবল হয়ে কোটর থেকে গিলে খেতে আসছে যেন।

ঘরময় কাগজের টুকরো ছড়ানো। অফিসার হুঙ্কার ছাড়লেন: কোন-কিছুতে কেউ হাত দেবেন না। ভিতরে ঢুকবেন না—দেখতে হয়, বারান্দা থেকে দেখুন।

টুকরো কাগজ খুঁটে খুঁটে জড় করা হচ্ছে। না, দরকারি কিছু নয়। এম-এ ডিগ্রি, বি-এ ডিগ্রি, আরও কত ট্রেনিং নিয়েছে সেই সমস্ত সার্টিফিকেট। কুচি কুচি করে ছিঁড়ে সমস্ত ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। মশলার দোকানে ঠোঙা বানিয়ে কাজে লাগাবে, তারও উপায় রাখেনি।

শিক্ষিত মানুষ হয়ে আত্মহত্যা করে বসলেন—ছিঃ!

বাইরে থেকে গলা বাড়িয়ে দেখে নিয়ে জয়ন্ত বিদ্রূপ-কণ্ঠে বলে, তাই বুঝি! কে বললেন কথাটা—সরকারি ভালো চাকরি বাগিয়ে দুধে-ভাতে আছেন, বলবেনই তো ভালো ভালো কথা! আদর্শের বুকনি আপনাদের মুখেই মানায় ভালো।

মরাটা ঠিক হয়েছে বলতে চান? এ তো পরাজয়।

জয়ন্ত উগ্রকণ্ঠে বলে, কোনটা ঠিক হত তবে? নিজে না মরে আপনাদের সব মেরে মেরে বেড়ানো? তা-ও হবে, তৈরি হতে লাগুন।

এদিক-সেদিক দেখতে দেখতে অফিসার টেবিলের উপরের একটা কাগজ তুলে নিলেন : এই যে, পেয়ে গেছি, চিঠি লিখে রেখে গেছেন।

চাঁদমোহন বলল, পাবেনই। নিয়মদস্তুর যেমনটি হতে হয়। অরুণ কখনো খুঁত রেখে কাজ করত না। চাকরি খোঁজার ব্যাপারে দিনের পর দিন দেখেছি।

অফিসার সশব্দে চিঠি পড়ছেন : আমার মৃত্যুর জন্য—

কে-একজন শেষটুকু পূরণ করে দিল : কেউ দায়ী নয়।

অফিসার ঘাড় নাড়লেন : সব কেসেই ঐ রকম লেখে—মরার জন্য কেউ দায়ী নয়। বাঁধি গৎ। ইনি দেখছি আলাদা কথা লিখেছেন—আমার মৃত্যুর জন্য রাজাসুদ্ধ দায়ী, কেবল আমি ছাড়া।

চাঁদমোহন অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, নির্জলা সত্যি। নিজে সে কখনো দায়ী নয়। চেষ্টার তিলেকমাত্র কসুর ছিল না, হলপ করে বলছি। একসঙ্গে ওঠা-বসা আমাদের, রাতদিনের সাঙাত—

শেষ করতে না দিয়ে জয়ন্ত গর্জে উঠল : সাঙাত বলবি নে চাঁদমোহন—বেইমান সে, স্বার্থপর। ওর একলারই যেন কষ্ট-দুঃখ—আমরা সব সুখের সাগরে সাঁতরে বেড়াচ্ছি! কোন-কিছু জানতে দিল না—জানালে পাছে সুইসাইড-প্যাক্ট করে বসি। একা একা ড্যাং-ড্যাং করে গিয়ে বেরুল।

দড়ি কেটে কনস্টেবলরা সন্তর্পণে মড়া নামাচ্ছে। অফিসার আর দেখতে পারেন না—দু-চোখে হাত ঢেকে বলেন, কী বীভৎস মশায়! রাত্রে ঘুম হবে না, স্বপ্নেও এই চেহারা দেখব। পরশু একটা সুইসাইডের কেস ছিল—মরেছেন বেশি মাত্রায় ঘুমের অষুধ খেয়ে। আহা-মরি মৃত্যু—মরেছেন না বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছেন, ধরা যায় না। এ ভদ্রলোক লিখলেন খাসা নতুন নতুন কথা, কিন্তু মান্ধাতার আমলের পথ নিতে গেলেন কেন?

জয়ন্ত অরুণেন্দুর দিকে আবার এক নজর তাকিয়ে বলে, আপনাদের সব জিভ বের করে ভেঙচে যাবে বলে।

* * *

মনিঅর্ডার পৌঁছে গেছে। অরুর পাঠানো টাকা পেয়ে আর কুপনে খবর পড়ে অনেকদিন পরে যশোদা আজ বিছানা ছেড়ে নেমে পড়েছেন—রোগ আরোগ্য হয়ে গেল নাকি? এতদিনে অভীষ্ট-সিদ্ধি—ঝাঁজ-শঙ্খে পাড়া তোলপাড় করে সত্যনারায়ণ-পূজো হচ্ছে, পূজোর সামনে সারাক্ষণ যশোদা করজোড়ে আছেন।

পূজো অন্তে আত্মরাম আচার্যের পুঁথিপাঠ এইবারে। তার মধ্যেও দেমাক করে আর একবার বলে নিলেন, কী ঠাকরুন, মনে পড়ছে না? শৈশবে হাত দেখে বলেছিলাম, এ-ছেলে রাজরাজ্যেশ্বর হবে—দিকপাল সম্রাট হবে। এই তো শুরু, চড়বড় করে এবারে চলল।

অরুণেন্দুর সুঠাম দেহখানা চিরে-ফেঁড়ে ছিন্নভিন্ন করেছিল, আবার এখন একত্র করে দিয়েছে। লাস-কাটা ঘরে পড়ে আছে সে।